কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

আগষ্ট—৮২

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

জুলে ভার্নে-র টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী : লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ॥ আগস্ট ॥ ১৯৮২
প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

বিজ্ঞান দিবসের ভাবনা

২রা আগস্ট ১৯৮২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১২১ তম জন্ম দিবস। এবং এই দিনটি বিজ্ঞানদিবস রূপেও চিহ্নিত। বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থা ও ক্লাব এই দিনটি বিজ্ঞান পদযাত্রা, সভা-সমিতি ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপন করবেন বলে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আচার্যের প্রতি শুধুমাত্র শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনই আজকের দিনের তাৎপর্য নয়, এসব কিছুরই মূল উদ্দেশ্য দেশের প্রতিটি নাগরিককে কতকটা বিজ্ঞান সচেতন করা। এবং এই ভাবনার অন্যতম প্রথম ও প্রধান প্রতিজ্ঞা—আমাদের পরিবেশ নির্মল রাখতে হবে—সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদকীয় : ১

দপ্তর থেকে
বাঁচার জন্য : সমরজিৎ কর ২

উপন্যাস
অল ইণ্ডিয়া কমন পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড : ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ২৯

গল্প
ডিমাপুরের ডিম রহস্য : দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭

পড়াশোনা
আলোকের প্রতিসরণ : অলক চক্রবর্তী ২৬
রসায়নের সহজপাঠ : অমরনাথ রায় ৪
উৎপাদক নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি : নন্দলাল মাইতি ১২
জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ : তারকমোহন দাস ৬

পশুপাখীর পরিচয়
মাছরাঙা পাখিদের কথা : অজয় হোম ৯

ছবিতে গল্প
জুলে ভার্নের টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী : গৌতম কর্মকার—দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদ
খুদে বৈজ্ঞানিক : দিলীপ দাস ২৪
হাবুলের বিজ্ঞানভাবনা : ধীরেন বল ৫৬

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
কিউবের রাজা : অনীশ দেব ৪২
ধাতু সম্মেলন : পার্থসারথি চক্রবর্তী ২৩
কেঁচো : বিনয়কুমার ভট্টাচার্য ২৫
সুজলা সুফলা আমাদের পৃথিবী : বিমান বসু ৩৭
রত্ন : সঙ্কর্ষণ রায় ১৫

বিবিধ
বিজ্ঞান সংবাদ : ২৮
বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৩৬

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
কৃতী বিজ্ঞানী শিশিরকুমার মিত্র : বিবেক রায় ৪৪

ছোটদের দপ্তর
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার উত্তরদাতাদের নাম ৪৯
প্রশ্নোত্তর : ৫০
অটোমেটিক কলিংবেল : নির্মলকান্তি ঘোষ ৫১
এককোষী জীব ব্যাকটিরিয়া : সৌমিত্র মজুমদার ৫৩
আবিষ্কার ও আবিষ্কারক : গৌতম গলুই ৫৪
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ৫৪ : বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার উত্তর ৫৪
ভেবে ভেবে বল : শুভব্রত রায়চৌধুরী ৫৫
শব্দকূট : নাজমুর নাহার ৫৫

[অনিবার্য কারণে এবারে 'চিঠিপত্র' বিভাগ প্রকাশ করা সম্ভব হল না—সম্পাদক]

বাঁচার জন্য

সমরজিৎ কর

বছর কয়েক আগে খুব মুশকিলে পড়েছিল উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের চাষীরা। ডুয়ার্সের নাম নিশ্চয় তোমরা শুনেছ। হিমালয় পর্বত ঢালু হয়ে নেমে এসেছে সেখানে। চারদিকে জঙ্গল। মাঝে মাঝে চা বাগান। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এলে পড়ে সমভূমি। সেখানে চাষীরা ধান চাষ করে। সে জমিতে ধানের ফলনও হয় ভালো।

কার্তিক মাস। মাঠ ভরা ধান! একদিন ভোরে দেখা গেল হঠাৎ এক দঙ্গল বুনো হাতি সেই ধান ক্ষেতে চড়াও হয়েছে। আর মক মক করে সাবাড় করছে ধান। আর শুধু কি ধান? চাষীদের ঘরবাড়িতেও ধাওয়া করল তারা। বাগানের গাছপালা খেল। দুমরে দিল অনেকের ঘর।

গ্রামের লোকেরা ভাবলো, ওরা হয়ত পাগলা হাতি। বন থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভয়ে অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। তারপর ঘণ্টা দুই তিন কেটে গেলে গ্রামে ফিরে দেখলো, গোটা ময় যেন দক্ষযজ্ঞ ঘটে গেছে। কলাগাছ সাবাড়। মাঠের ধান প্রায় শেষ। চাষীদের একেবারে মাথায় হাত। একবার নয়। এমন ঘটনা কয়েকবারই ঘটল উত্তরবঙ্গে। বুনো হাতির দাপটে প্রমাদ গুনলো চাষীরা। অনেক গৃহস্থও।

বনের হাতি হঠাৎ লোকালয়ে এসে অমন তাণ্ডব চালালো কেন? নানা জনের মুখে নানান কথা। কেউ বললো, নিশ্চয় বনে গিয়ে কেউ হাতিদের বিরক্ত করেছিল। তার শোধ তুলতে এসেছিল হাতিরা। কেউ বললো, হাতিগুলো নিশ্চয় কোন কারণে পাগল হয়ে গেছে। এমন অনেক কথা।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, কারণটা অন্য। হাতি গাছের পাতা খায়। কলাগাছ খায়। ওই অঞ্চলের বনে এক ধরনের ঘাস জন্মায়। সেই ঘাসও তাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে জ্বালানির জন্যে সেখানকার গাছপালা নির্মূল করেছে গ্রামের মানুষ। ঘাস কেটেছে ঘর ছাওয়ার কাজে। ফলে হাতির খাবারে পড়েছে টান। তাই নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত খাদ্যের অন্বেষণে তাদের ধাওয়া করতে হয়েছে চাষীদের ধানের ক্ষেত এবং ঘরবাড়ি।

আরও একটি ঘটনার কথা বলি। সেবার গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র থেকে খবর পাওয়া গেল গম, জোয়ার, আর ভুট্টার ক্ষেত প্রায় নির্মূল হতে চলেছে। আর তার জন্যে দায়ী ইঁদুর। চাষীরা লক্ষ করলো, তাদের জমিতে হঠাৎ ইঁদুরের অত্যাচার গেছে বেড়ে। আর সে কি ইঁদুর! এক একটির আয়তন যেন বেড়ালের মত। রাত নামলে দলে দলে ধেড়ে ইঁদুর এসে হাজির হয় চাষের জমিতে। তারপর সারা রাত ধরে চলে মোচ্ছব। সেই ইঁদুর তাড়াতে গিয়ে চাষীদের হিমশিম খাওয়ার মত অবস্থা।

হঠাৎ ইঁদুরের এমন উপদ্রব বাড়লো কেন? অত ইঁদুরই বা এলো কোত্থেকে?

ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধান চালালেন বিজ্ঞানীরা। অনুসন্ধানের পর ওঁরা বললেন, ইঁদুরের সংখ্যা বেড়েছে। ওদের খাবারে পড়েছে টান। তাই পেটের দায়ে ওদের ছুটে আসতে হয়েছে গম, জোয়ার এবং ভুট্টার ক্ষেতে।

ইঁদুরের সংখ্যা হঠাৎ কেন বাড়লো?

বাড়বে না? বললেন বিশেষজ্ঞরা। গত কয়েক বছর ধরে মানুষ শহর শহরতলি গড়তে গিয়ে বন জঙ্গল কেটে ফেলেছে। বন জঙ্গল কেটে বের করেছে জমি, সেই জমিতে তুলেছে ঘরবাড়ি। সেই জমি চাষের কাজেও লাগিয়েছে। আগের তুলনায় লোকজন বেড়েছে কত! তাদের খেতে হবে তো! তার জন্যে প্রচুর খাদ্যশস্য ফলানো দরকার। বনের জমি এখন সেই কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে। আর এর ফল দাঁড়িয়েছে উল্টো। ওই অঞ্চলে বাস করতো প্রচুর পেঁচা। আরও কত রকম নিশাচর পশুপাখি। যখন জঙ্গল ছিল, তখন। রাতে ওরা ইঁদুর ধরে খেত, তাই ইঁদুরের বাড়বাড়ন্তও হত না। এখন বন জঙ্গল নেই। পেঁচা বা নিশাচর পশুপাখি তাদের আশ্রয় হারিয়ে কোথায় চলে গেছে। তাদের সংখ্যাও কমে গেছে অনেক। ফলে ইঁদুর খাওয়ার কেউ নেই আর। এমন অবস্থায় ইঁদুর তো বাড়বেই।

একটি সংবাদে দেখছিলাম, পৃথিবীর বহু পাখি নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। আর এর প্রধান কারণ চাষবাস। জনসংখ্যা বাড়ছে। ভারতের কথাই ধরো। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে এদেশের জনসংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ কোটি। এখন দাঁড়িয়েছে সাতষট্টি কোটিতে। এত মানুষকে খাওয়াতে গিয়ে খাদ্যশস্য ফলাতে হচ্ছে প্রচুর। আর সেই প্রচুর খাদ্য ফলাতে গিয়ে চাষের জমিতে ছড়ান হচ্ছে বিষাক্ত কীটনাশক ওষুধ। ডি ডি টি, অলড্রিন-আরও কত কি! এই সব ওষুধ মাটিতে মিশে থাকে। বৃষ্টির ধোয়ানিতে গিয়ে পড়ে পুকুর, নদী এবং সমুদ্রে। শস্যদানার মধ্যে জমে এই বিষ। মাছের শরীরেও জমে। ওই বিষাক্ত মাছ এবং শস্যদানা পশুপাখি খায়। খেয়ে অসুস্থ হয়। অনেকে মারা পড়ে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ডিডিটি মিশ্রিত খাবার খাওয়ার দরুন ডাহুক, বক,

পেলিকান প্রভৃতি পাখির ডিমের খোলা নরম হয়। ডিম পাড়ার পর সেই ডিম যায় ভেঙে। তা দিয়ে বাচ্চা ফোটান সম্ভব হয় না। তাই পাখির সংখ্যা কমছে।

বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে ছড়িয়ে পড়ছে পোড়া কয়লা এবং তেলের জঞ্জাল। সেই সব জঞ্জালের অন্যতম অংশ কার্বন ডাই অক্সাইড। আজ থেকে দুশ' বছর আগেও বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড ছিল প্রতি দশ লক্ষ ভাগে ২৩০ ভাগের মত। এখন তা এসে দাঁড়িয়েছে ৩৪০তে। এই গ্যাস শোষণ করে উত্তাপ শক্তি। ফলে আবহাওয়ার তাপমাত্রা বাড়ছে। গত ১০০ বছরে তাপমাত্রা বেড়েছে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মত। যদি তাপমাত্রা আরও বাড়ে, জল ঝড়ও বাড়বে। সেই সঙ্গে গলবে দক্ষিণ মেরুর বরফ। বরফ গলা জলে সমুদ্রের জল বাড়বে। প্লাবিত হবে সমুদ্র।

এ ছাড়া রঙের কারখানা, হিমঘর এবং ফ্রিজ থেকে বেরোচ্ছে ফ্রেয়ন নামে এক ধরনের গ্যাস। এই গ্যাস এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড বাতাসে গা ভাসিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উঠছে। উঠে বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তরের সঙ্গে ঘটাচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া। ওজন ভেঙে করছে অক্সিজেন। ফলে ওজন স্তর হাল্কা হচ্ছে। সূর্য থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে অতিবেগুনী রশ্মি। ওজন স্তর এই বিপজ্জনক রশ্মির বড় একটি অংশ শুষে নেয় বলে জীব জগতের ক্ষতি হয় না। ওজন স্তর পাতলা হওয়ায় এই শুষে নেওয়ার সম্ভাবনা কমেছে।

সমুদ্রে চলছে তেলবাহী জাহাজ। আরও কত জাহাজ। ওইসব জাহাজের জঞ্জালও কলুষিত করছে সমুদ্রের জল। এর ফলে সামুদ্রিক প্রাণী এবং উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

পথেঘাটে চলছে অজস্র মোটর গাড়ি। তাদের বুক

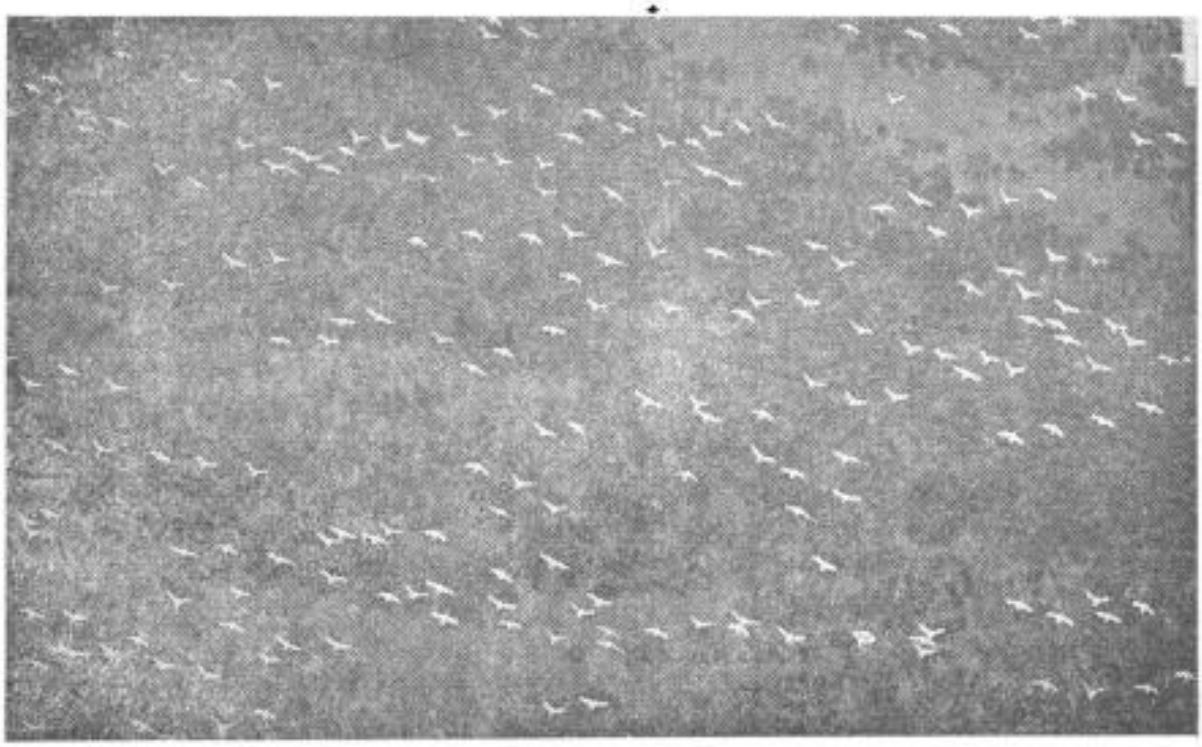

এঁদেরকে বাঁচাতে হবে।

চাষ করতে গিয়ে মাটি আলগা করা হয়েছে প্রচুর জমিতে। বর্ষায় সেই জমির মাটি ধোয়ানি হিসেবে পড়ছে নদীতে। নদী মজে যাচ্ছে। কলকারখানার রাসায়নিক জঞ্জাল ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে নদীর জলে। থর মরুভূমি শুধু গাছ কাটার ফলেই আরও ব্যাপক হচ্ছে। ক্রমে এগিয়ে আসছে দিল্লি, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার দিকে।

চাষের জমিতে দেওয়া হচ্ছে প্রচুর নাইট্রোজেন সার। সেই সার থেকে তৈরি হচ্ছে নাইট্রোজেনের অক্সাইড।

কাঁপানো বাঁশির শব্দও কি শরীরের পক্ষে কম ক্ষতিকর। অতিরিক্ত শব্দ স্মৃতিভ্রংশ ঘটায়, রক্ত চাপ বাড়ায়, হৃদরোগ সৃষ্টি করে। এক ধরনের শব্দ মানুষকে অন্ধও করে দিতে পারে।

যা বলছিলাম। মানুষের হাতে পড়ে এই যখন পরিবেশের অবস্থা, তখন উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ জল, হাওয়া এবং মাটি যাতে দূষণমুক্ত থাকে—সে ব্যাপারে আমরা প্রত্যেকেই যেন চেষ্টা করি। চেষ্টা তোমাদেরও করতে হবে।

জৈব রসায়নের বিক্রিয়া

অমরনাথ রায়

জৈব রসায়নের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া ঃ

অজৈব রসায়নের বিক্রিয়ার প্রকারভেদ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অজৈব রসায়নের মত জৈব রসায়ন শাস্ত্রেও বিভিন্ন ধরনের বিক্রিয়া আছে। এই অধ্যায়ে কিছু বিশেষ বিশেষ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার আলোচনা করা হবে। এই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে বুঝে নিলে জৈব রসায়ন শাস্ত্রকে অধিগত করা সহজতর হবে।

(1) **জারণ বিক্রিয়া ঃ** মিথেন (CH_4) একটি অ্যালকেন। সহজ দাহ্য বলে অ্যালকেন যৌগকে বায়ুতে কিংবা অক্সিজেনে দহন করলে জ্বলে উঠে। দহনের ফলে জল ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O$$

এখানে প্যারাফিন (CH_4) জারিত হ'য়ে CO_2 ও জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়েছে।

আবার 'মিথেন' 200°C উষ্ণতায় কপার প্রভাবকের উপস্থিতিতে বায়ু দ্বারা জারিত হ'য়ে মিথাইল অ্যালকোহলে (CH_3OH) পরিণত হয়।

$$2CH_4 + O_2 = 2CH_3OH.$$

(2) **নাইট্রেশন ঃ** সংপৃক্ত হাইড্রোকার্বনের H পরমাণুকে [$-NO_2$] মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার পদ্ধতিকে 'নাইট্রেশন' বলে। সাধারণ অবস্থায় অ্যালকেনের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের (HNO_3) কোন বিক্রিয়া হয় না। উচ্চ উষ্ণতায়, কয়েকটি অ্যালকেন HNO_3 বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে 'নাইট্রো-অ্যালকেন' উৎপন্ন করে। যথা, 400°C উষ্ণতায় নাইট্রিক অ্যাসিড বাষ্পের সঙ্গে ইথেন ($C_2H_5NO_2$).

$$C_2H_5 : H + HO : NO_2 = C_2H_5NO_2 + H_2O$$

(3) **হ্যালোজেনেশন ঃ** হ্যালোজেন দ্বারা প্যারাফিন যৌগের হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপনের বিক্রিয়াকে 'হ্যালোজেন সংযোজন' বা হ্যালোজেনেশন বলে। এই বিক্রিয়া অন্ধকারে সংঘটিত হয় না, সূর্যালোকে বা অতি-বেগুনী আলোতে সংঘটিত হয়। সমস্ত হ্যালোজেন সমহারে বিক্রিয়া করে না। এদের সক্রিয়তা $Cl > Br > I$ ক্রম অনুসারে হ্রাস পায়।

উদাহরণ ঃ $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow[\text{সূর্যালোক}]{\text{বিক্ষিপ্ত}} CH_3Cl + CHl$

বিক্ষিপ্ত সূর্যালোকে মিথেন (CH_4) ক্লোরিনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে মিথাইল ক্লোরাইড (CH_3Cl) ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) উৎপন্ন করে।

(4) **সালফোনেশন ঃ** সংপৃক্ত হাইড্রোকার্বনের H পরমাণুকে সালফোনিক অ্যাসিড মূলক [$-SO_3H$] দ্বারা প্রতিস্থাপনের বিক্রিয়াকে সালফোনিক অ্যাসিড মূলক সংযোজন বা সালফোনেশন বলে।

সাধারণ অবস্থায় অ্যালকেনের সঙ্গে H_2SO_4 এর কোন বিক্রিয়া হয় না। তবে ধূমায়মান H_2SO_4 মিথেন বা ইথেন এর সঙ্গে 400°C উষ্ণতায় বিক্রিয়া ক'রে যথাক্রমে 'মিথেন সালফোনিক অ্যাসিড' ও 'ইথেন সালফোনিক অ্যাসিড' উৎপন্ন করে। উদাহরণ ঃ -

$$CH_4 + OH.HSO_3 = CH_3SO_3H + H_2O$$

(মিথেন সালফোনিক অ্যাসিড।)

(5) **তাপ বিয়োজন** (Pyrolysis) **ঃ** তাপ প্রয়োগে প্যারাফিন বিযোজিত হয়ে অপেক্ষাকৃত কম পারমাণবিক গুরুত্ব বিশিষ্ট সংপৃক্ত বা অসংপৃক্ত হাইড্রোকার্বন উৎপন্ন করে। একে জৈব যৌগের 'তাপ বিযোজন' বলে। উদাহরণ ঃ

$$CH_3CH_2CH_3 \xrightarrow{600°C} \begin{cases} \rightarrow CH_3CH=CH_2 + H_2 \\ \quad (\text{প্রোপিলিন}) \\ \rightarrow CH_2=CH_2 + CH_4 \\ \quad (\text{ইথিলিন}) \end{cases}$$

(6) **প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ঃ** জৈব যৌগের কোন পরমাণু বা পরমাণুপুঞ্জ অপর কোন পরমাণু বা পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবার বিক্রিয়াকে 'প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া' বলে। এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থকে প্রতিস্থাপিত যৌগ বলে। উদাহরণ ঃ—

বিক্ষিপ্ত বা মৃদু সূর্যালোকে মিথেনের (CH_4) H পরমাণু ক্লোরিন পরমাণু দ্বারা ক্রমান্বয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে যথাক্রমে মিথাইল ক্লোরাইড, মিথিলিন ক্লোরাইড, ক্লোরোফর্ম ও কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড উৎপন্ন করে।

$CH_4 + Cl_2 = HCl + CH_3Cl$ (মিথাইল ক্লোরাইড)

$CH_3Cl + Cl_2 = HCl + CH_2Cl_2$ (মিথিলিন ক্লোরাইড)

$CH_2Cl_2 + Cl_2 = HCl + CHCl_3$ (ক্লোরোফর্ম)
$CHCl_3 + Cl_2 = HCl + CCl_4$ (কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড)

(7) **ভার্জ বিক্রিয়া** (Wurtz reaction) ঃ অ্যালকিল হ্যালাইড থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতির জন্যে এই বিক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়। এই বিক্রিয়ার আবিষ্কর্তা ফরাসী রসায়নবিদ 'অ্যাডল্‌ফ ভার্জ (Adolphe Wurtz)। উদাহরণ ঃ—

মিথাইল আয়োডাইডকে শুষ্ক ইথারে দ্রবীভূত ক'রে ধাতব সোডিয়াম যুক্ত করলে ইথেন গ্যাস ($CH_3.CH_3$) উৎপন্ন হয়।

$$CH_3I + 2Na + ICH_3 = CH_3.CH_3 + 2NaI$$

এই বিক্রিয়ার দ্বারা যে কোন হাইড্রোকার্বন যৌগ খুব সহজে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। যেমন ঃ—

$$C_2H_5I + 2Na + IC_2H_5 = C_4H_{10} + 2NaI$$
(n-বিউটেন)

$$CH_3I + 2Na + IC_2H_5 = C_3H_8 + 2NaI$$
(প্রোপেন)

(8) **কোল্‌বের বিক্রিয়া** (Kolbe s reaction) ঃ ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণের জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ ক'রে এই পদ্ধতিতে অ্যালকেন প্রস্তুত করা যায়। সোডিয়াম বা পটাসিয়াম অ্যাসিটেটের জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানী কোল্‌বে সর্বপ্রথম 'ইথেন' প্রস্তুত করেন নিম্নলিখিত উপায়ে।

$$2CH_3COONa \rightleftharpoons 2CH_3COO^- + 2Na^+$$

ক্যাথোডে ঃ $Na^+ + e = Na$; $2Na + H_2O = 2NaOH + H_2\uparrow$

অ্যানোডে ঃ $2CH_3COO^- - 2e = 2CH_3COO$; $2CH_3COO = C_2H_6 + 2CO_2$

এই পদ্ধতিতে ইথিলিনও প্রস্তুত করা যায়। ইথিলিন প্রস্তুত করতে হলে সোডিয়াম সাক্সিনেটের জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে হয়। অ্যানোডে ইথিলিন গ্যাস নির্গত হয়।

$$\begin{array}{l} CH_2COONa \\ | \\ CH_2COONa \end{array} + 2H_2O \rightarrow \begin{array}{c} CH_2 \\ \| \\ CH_2 \end{array} + 2CO_2\uparrow + 2NaOH + H_2\uparrow$$

(9) **ওজোন বিশ্লেষণ** (Ozonolysis) ঃ ওজোনের (O_3) সঙ্গে বিক্রিয়ায় ইথিলিন যুক্ত যৌগ 'ইথিলিন ওজোনাইড' উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি জৈব দ্রাবক, যথা কার্বন-টেট্রা ক্লোরাইড, ক্লোরোফর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

$$H_2C = CH_2 + O_3 \rightarrow \begin{array}{ccc} H_2C & — O — & CH_2 \\ | & & | \\ O & ——— & O \end{array}$$
(ইথিলিন-ওজোনাইড)

ইথিলিন ওজোনাইডকে জলের সঙ্গে উত্তপ্ত করলে ফরম্যালডিহাইড ও হাইড্রোজেন পার অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াকে ওজোন বিশ্লেষণ বলে। এই বিক্রিয়ার সাহায্যে কার্বন যৌগে দ্বি-বন্ধের অনুশীলন করা যায়।

$$\begin{array}{ccc} H_2C & — O — & CH_2 \\ | & & | \\ O & ——— & O \end{array} + H_2O \rightarrow 2HCHO + H_2O_2$$

(10) **বহু সংযোগ ক্রিয়া** (Polymerisation) ঃ যে বিক্রিয়ায় একটি সরল যৌগের দুই বা তার বেশী অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি নতুন এবং অধিকতর জটিল আণবিক গঠন বিশিষ্ট যৌগ উৎপন্ন করে তাকে বহুসংযোগ ক্রিয়া (পলিমেরিজেশন) বলে এবং উৎপন্ন পদার্থকে পলিমার (Polymer) বলে। পলিমারটির আণবিক গুরুত্ব মূল পদার্থ (মনোমার) অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। উদাহরণ ঃ—

5 থেকে 10 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে এবং 70°C উষ্ণতায় ইথাইল অ্যালুমিনিয়ামের উপস্থিতিতে, কিংবা 500 থেকে 1000 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে এবং 150°C—200°C উষ্ণতায়, অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন পার অক্সাইড অনুঘটকের উপস্থিতিতে অনেকগুলি ইথিলিন (C_2H_4) অণু একত্রিত হয়ে 'পলি ইথিলিন' বা 'পলিথিন' নামক প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন করে।

$$n (CH_2 = CH_2) \rightarrow (—CH_2—CH_2—)_n$$

এক্ষেত্রে ইথিলিন হলো মনোমার (monomer) এবং পলিথিন হলো 'পলিমার'।

(11) **যুত বিক্রিয়া** (Addition reaction) ঃ অ্যালকিন বা অ্যালকাইন শ্রেণীর যৌগগুলি অসংপৃক্ত। এই যৌগগুলিতে অন্ততঃ দু'টি কার্বন পরমাণু দ্বি বন্ধ (অ্যালকিন-এর ক্ষেত্রে) বা ত্রি-বন্ধ (অ্যালকাইন-এর ক্ষেত্রে) দ্বারা যুক্ত থাকায় কার্বন পরমাণুগুলির সব যোজ্যতা পূরণ হয় না। ফলে ঐ সব অণুগুলি সব সময় একটা পীড়িত অবস্থায় থাকে এবং সুযোগ পেলেই দ্বি বা ত্রি-বন্ধনগুলি খুলে ফেলে। তখন তারা ঐ মুক্ত যোজকের সাহায্যে অন্য মৌলের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে সংপৃক্ত যৌগ গঠন করে। এই রকম যৌগকে বলা হয় 'যুত যৌগ'। যুত যৌগের সংজ্ঞা এই রকম ঃ—

যে বিক্রিয়ায় কোন অসংপৃক্ত যৌগের অণু অন্য কোন অণুর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়, অণু দুটির কোন অংশই পৃথক হয় না, ঐ রকম বিক্রিয়াকে 'যুত বিক্রিয়া' বলে। যুত বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন যৌগকে 'যুত যৌগ' বলে। উদাহরণ ঃ—

$$H—\underset{H}{\underset{|}{C}} = \underset{H}{\underset{|}{C}}—H + Br_2 = H-\overset{Br}{\overset{|}{\underset{H}{\underset{|}{C}}}}—\overset{Br}{\overset{|}{\underset{H}{\underset{|}{C}}}}—H$$

(ইথিলিন ডাই ব্রোমাইড)

[পরবর্তী সংখ্যায় আরও বিক্রিয়ার আলোচনা হবে।]

জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ

আমাদের পরিবেশ—আলো

ডক্টর তারকমোহন দাস

গত সংখ্যায় আমরা পরিবেশের উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। বাতাস, জল, মাটির মত আলোও আমাদের পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সূর্য থেকেই আমরা মূলতঃ আলো ও উত্তাপ পাই। এই আলো এবং উত্তাপ সকল জীবেরই একান্ত প্রয়োজন। আলোর অভাবে আমরা কিছুই দেখতে পাই না। অন্ধকারে আমাদের সকল কাজকর্মই অচল হয়ে পড়ে। অজস্র রকম পাখি, জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ আছে,—যেমন কাক, মুরগী, প্রজাপতি, মৌমাছি ইত্যাদি যারা ভোর-বেলায় সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই আহার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে, আবার সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে বাসায় ফিরে বিশ্রামের আয়োজন করে। কিন্তু পেঁচা, শেয়াল, বাঘ, হায়না প্রভৃতি আরো বহু নিশাচর প্রাণী আছে যারা রাত্রের অতি ক্ষীণ আলোকে ভালই দেখতে পায় এবং রাত্রেই বিশ্রামরত প্রাণীদের শিকার করবার জন্যই তারা তৎপর হয়ে ওঠে।

সৌর বিকিরণের ফলে আমাদের পৃথিবীর আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সূর্যের তাপে জল বাষ্প হয়ে আকাশে ওঠে, সেখানে সূক্ষ্ম ধূলিকণার সংস্পর্শে ঠাণ্ডায় ঐ বাষ্প জমে মেঘ হয়, মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হয়। আবার কিছু মেঘ পর্বতের সুউচ্চ চূড়ায় শীতলতম প্রদেশে গিয়ে জমে বরফে পরিণত হয়। সেই বরফ গরমকালে সূর্যের তাপে গলে জলধারার সৃষ্টি করে। সেই জলধারা নেমে নদী-নালা পূর্ণ করে, মাটি সরস হয়, সকল রকম উদ্ভিদ সেই জল শোষণ করে জীবনধারণ করে, আমরাও ঐ জল ব্যবহার করে থাকি। পরিবেশের উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশে কাল বৈশাখীর ঝড় ওঠে।

পৃথিবীর অধিকাংশ জীবই একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতার মধ্যে জীবনধারণে অভ্যস্ত। সর্বনিম্ন ১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং সর্বোচ্চ ৩৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হল পৃথিবীর অধিকাংশ জীবের জীবনধারণের পক্ষে অনুকূল উষ্ণতা। উষ্ণতা এর থেকে কম বা বেশী হলে অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারণে প্রচণ্ড অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

আর সবুজ গাছপালা আলো ছাড়া তো বাঁচেই না। গাছ সূর্যের আলোর সাহায্যে সবুজ পাতার মধ্যে খাদ্য তৈরি করে, আমরা যাকে সালোকসংশ্লেষ বলি। আলো না পেলে ঐ খাদ্য তৈরি হয় না, খাদ্য না পেলে উদ্ভিদ বাঁচে না, আর ঐ খাদ্য না পেলে মানুষ-সমেত পৃথিবীর সকল প্রাণীরই বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং, সহজেই বোঝা যায় সূর্যের আলোর সঙ্গে পৃথিবীর সকল রকম জীবই ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। অনেক রকম গাছ আছে যাদের ফুল ফোটা নির্ভর করে দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যের তারতম্যের ওপর। শীতকালে আমাদের দেশে অনেক মরশুমী ফুল ফোটে, যেমন এস্টার, চন্দ্রমল্লিকা, কস্‌মস্, ইত্যাদি ;—শীতকালে ঠাণ্ডার প্রভাবে যে এদের দেহে ফুল ধরে তা নয়, শীতকালে দিনের পরিমাণ ছোট এবং রাতের পরিমাণ বড় বলেই এদের দেহে ফুল ফোটে। এদের বলা যেতে পারে ছোটদিনের গাছ (Shortday plant)। তেমনি কিছু গাছ আছে শীতপ্রধান দেশের গ্রীষ্মকালে দিনের পরিমাণ যখন খুব দীর্ঘ হয় তখনই তাদের দেহে ফুল আসে, এদের বলা যেতে পারে বড় দিনের গাছ (Longday plant) যেমন আলু, বীট, রাই। আবার কিছু গাছ আছে যখন দিন ও রাতের পরিমাণ সমান সমান হয় তখনই তাদের ফুল ধরে, যেমন আমাদের দেশের তেলাকুচা। অনেক গাছ অবশ্য আছে যারা এই দিন-রাতের তারতম্যের তোয়াক্কা রাখে না,—যেমন টম্যাটো, কার্পাস তুলা ইত্যাদি। শামুক জাতীয় কিছু প্রাণীও আছে যাদের ডিম দেবার সঙ্গে দিন-রাতের দৈর্ঘ্যের তারতম্যের সম্পর্ক আছে। যাযাবর পাখিদের দলবেঁধে এক দেশ থেকে অন্যদেশে বিশেষ ঋতুতে উড়ে যাবার সঙ্গেও অনেকে লক্ষ্য করেছেন এই দিন-রাতের দৈর্ঘ্যের একটা সম্পর্ক আছে।

আলো এক রকম শক্তি। পৃথিবী থেকে সূর্য প্রায় ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে। সূর্য থেকে যে প্রচণ্ড তেজরশ্মি প্রতিনিয়ত মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ছে তার প্রায় ২২০ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথিবীতে

এসে পৌঁছায়,—কিন্তু তাও বড় অল্প নয়, দুপুর রৌদ্রের তেজ কি রকম প্রচণ্ড হয় তা আমরা সকলেই জানি। আমাদের প্রতি হেক্টর জমিতে (১০০০×১০০০= ১০,০০০০ বর্গ মিটার) প্রতিদিন গড়ে চার কোটি কিলো-ক্যালোরি সৌরশক্তি এসে পৌঁছায়। এক গ্রাম জলের তাপমাত্রা এক ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড বাড়াতে যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন হয় তাকে 'এক ক্যালোরি' তাপশক্তি বলে। এক হাজার ক্যালোরিতে এক কিলো-ক্যালোরি হয়। আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য প্রতিদিন ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ কিলো ক্যালোরি শক্তির প্রয়োজন হয়, আমরা খাদ্য থেকেই এই শক্তি সংগ্রহ করি।

এই এক হেক্টর জমিতে যতটা সৌরশক্তি আসে তার সবটাই যদি ধান বা গমের শিষের মধ্যে বাঁধা পড়ত তাহলে ঐ জমি থেকে প্রতিদিন ১৩,০০০ মানুষের অন্নসংস্থান হতে পারত মাথা পিছু ৩,০০০ ক্যালোরি হিসাবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় এক হেক্টর জমি ভাল করে সারা বছর ধরে চাষ করলে তাতে যে ফসল ফলে তাতে গড়ে মাত্র ১৩ জন মানুষের প্রতিদিন অন্নসংস্থান হয়ে থাকে,—মাথা পিছু ৩,০০০ কিলো ক্যালোরি হিসাবে। কোথায় তের হাজার আর কোথায় তের,—এই বিরাট ব্যবধানটা ঘটছে কেন? এই বিরাট ব্যবধান ঘটবার মূল কারণ উদ্ভিদ নিজেই। যতটা সৌরশক্তি জমিতে আসে উদ্ভিদ তার শতকরা একভাগ মাত্র নিজের দেহে আবদ্ধ করতে পারে। তার মানে, এক হেক্টর জমিতে যেখানে ১৩,০০০ মানুষের অন্নসংস্থানের উপযোগী সৌরশক্তি আসছে উদ্ভিদ সেখানে মাত্র ১৩০ জন মানুষের উপযোগী শক্তি নিজের দেহের মধ্যে আবদ্ধ করছে। উদ্ভিদ যে সৌরশক্তি সংগ্রহ করে তা নিজের জন্যই করে, অনেকের ধারণা উদ্ভিদ আমাদের জন্যই নিজ দেহে সৌরশক্তি সংগ্রহ করে থাকে, এ ধারণাটা ঠিক নয়। উদ্ভিদ যতটা সৌরশক্তি নিজ দেহে আবদ্ধ করে, তার শতকরা ৮০-৯০ ভাগ নিজেই খরচ করে ফেলে নানা কাজে,—যেমন, বৃদ্ধি জনন, কোষ বিভাজন ইত্যাদিতে। তাছাড়া যে সব জীবাণু গাছের ওপর বাস করে তারাও যথেষ্ট শক্তি টেনে নেয় গাছের কাছ থেকে। আর আমরা তো সমস্ত গাছটা পাই না পাই শুধু তার ফল বা বীজ, সুতরাং উদ্ভিদ যতটা সৌরশক্তি সংগ্রহ করে তার শতকরা ১০ ভাগের বেশী তাদের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই এক হেক্টর জমিতে ১৩০জন মানুষের অন্ন-সংস্থানের উপযোগী শক্তি উদ্ভিদ ধরে রাখলেও,—উদ্ভিদের কাছ থেকে মাত্র ১৩জন মানুষের জীবন-ধারণের উপযোগী শক্তি পাওয়া যেতে পারে। কারণ বাকীটা উদ্ভিদ নিজেই ব্যয় করে ফেলে নিজের জীবন-ধারণের জন্য।

তাই আমাদের যদি ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তি পেতে হয়, আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ করতে হয়, তাহলে আমাদের চারপাশে যথেষ্ট উদ্ভিদের উপস্থিতির প্রয়োজন আছে। এটা হিসাব করে দেখা গেছে যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ সমেত একভাগ প্রাণীর জীবনরক্ষা করতে হলে, তার জন্য উপযুক্ত খাদ্য বা শক্তি সংগ্রহ করতে হলে তার নিজের ওজনের অন্তত ৯৯ গুণ বেশি সবুজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব রক্ষা করা দরকার। পৃথিবীতে প্রতিদিন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে গড়ে এক লক্ষ সাতাশী হাজার, সুতরাং সহজেই বোঝা যায় এই বর্ধিত জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে অর্থাৎ তার মোট ওজনের ৯৯ গুণ বেশী পরিমাণে প্রতিদিনই আমাদের সবুজের আচ্ছাদন বাড়িয়ে যাওয়া দরকার। আমরা কি তা বাড়াচ্ছি? বাস্তবিক পক্ষে আমরা ঠিক তার উল্টো কাজ করছি। একশ' বছর আগে পৃথিবীতে যে পরিমাণ সবুজের আচ্ছাদন ছিল বর্তমানে তার শতকরা ২৫ ভাগ কমে গিয়েছে, শহর, কলকারখানা, রাস্তাঘাট এবং মরুভূমির প্রসারের ফলে, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশী। সুতরাং মনে হয় আমরা এমন একটা যুদ্ধ করছি কোনোদিনই যা জিততে পারব না।—একটা সদ্যজাত শিশু তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জননীর ওপর যতটা নির্ভরশীল আমরা তার থেকেও বেশী নির্ভর করে থাকি উদ্ভিদের ওপর। সুতরাং আমরা আজ যে ব্যাপকভাবে গাছপালা ধ্বংস করছি, সবুজের আচ্ছাদন সঙ্কুচিত করছি সেটা আমরা নিছক গায়ের জোরেই করছি, তার পেছনে না আছে কোন বিজ্ঞান, না আছে কোন স্থায়ী মঙ্গলের সম্ভাবনা।

ভূ-পৃষ্ঠের শতকরা ৭১ ভাগ জুড়ে রয়েছে সমুদ্র। সমুদ্রের মধ্যে যে বিশাল প্রাণিজগৎ রয়েছে তারাও সৌরশক্তি সংগ্রহ করে সবুজ উদ্ভিদের মাধ্যমেই। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০০-৪০০ ফুট অবধি জলের তলায় সূর্যের আলো পৌঁছায়. এই অঞ্চলটিকে বলে ফোটিক জোন (Photic zone)। এই আলোকিত অঞ্চলে অসংখ্য অনুবীক্ষণিক সবুজ শ্যাওলা জাতীয়

উদ্ভিদ বাস করে, তারা অধিকাংশই ডায়াটম শ্রেণীর এককোষী সবুজ শ্যাওলা, সূর্যের আলো থেকে তারা যে শক্তি সংগ্রহ করে নিজ দেহের মধ্যে ছোট-ছোট মাছেরা তাদের খেয়ে ঐ শক্তি সংগ্রহ করে, আর বড় বড় মাছেরা ছোট ছোট মাছ খেয়ে ঐ শক্তি সংগ্রহ করে। এইভাবে সমুদ্রের মধ্যেও সূর্যের আলো থেকে শক্তির হস্তান্তর ঘটে থাকে সবুজ উদ্ভিদের মাধ্যমে অন্যান্য প্রাণীর দেহে।

সমুদ্রের ঐ এককোষী সবুজ শ্যাওলাগুলি কিন্তু সূর্যের প্রখর আলো সহ্য করতে পারে না। তাই দিনের বেলায় চড়া রোদ উঠলে তারা জলের আরো নিচে নেমে যায় যেখানে দিনের আলোর তীব্রতা কম, তার ফলে সামুদ্রিক মাছেরাও দিনের বেলায় সমুদ্রের অনেক নিচে থাকে, কেননা সেখানেই তারা খাবার পায়। কিন্তু রাত্রে বিশেষত ভোরের দিকে ঐ শ্যাওলাগুলি আবার জলের ওপরের স্তরে উঠে আসে আলোর সন্ধানে এবং তার পেছনে পেছনে মাছের ঝাঁকও ওপরে উঠে আসে। তাই সমুদ্রে যারা মাছ ধরে তারা রাত্রেই মাছ ধরতে বেরয়। পুরীতে নুলিয়াদের মাছ ধরা যারা দেখেছ তারা সকলেই হয়ত লক্ষ্য করেছ নুলিয়ারা রাত থাকতেই মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ে এবং সকালে রোদ উঠতে-না-উঠতেই তারা মাছ নিয়ে ফিরে আসে। আলোর প্রভাবে সামুদ্রিক শ্যাওলাদের এই ওপর-নিচ-ওঠা-নামার বিচিত্র ঘটনাটাই এর জন্য দায়ী।

এবার পরীক্ষা করে দেখা যাক এতক্ষণ যে সব কথা বলা হল তা কতদূর সত্য। এর প্রত্যেকটি বিষয়ই পরীক্ষা করে দেখা উচিত—আমাদের পরিবেশে। ঠিক ঐ ভাবে এগুলি ঘটছে কিনা! কিন্তু তার জন্য অনেক কিছু জটিল যন্ত্রপাতির দরকার হবে। সুতরাং জটিল পরীক্ষাগুলি বাদ দিয়ে আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব সেই রকম তিনটি পরীক্ষার বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

সবুজ উদ্ভিদ নিজ দেহের মধ্যে যে শক্তি সংগ্রহ করে রাখে তা খুব সহজেই পরীক্ষা করে দেখান যায়। কিছু শুকনো খড় যোগাড় কর এবং তাতে আগুন ধরিয়ে লক্ষ্য কর ঐ আগুন থেকে কি রকম আলো ও উত্তাপ আসছে। এই আলো ও উত্তাপ খড়ের মধ্যে যে জৈব পদার্থ ছিল তার দহনের ফলেই আসছে। এই জৈব পদার্থ সূর্যের আলোয় সালোকসংশ্লেষের ফলেই উৎপন্ন হয়েছে এবং ঐ সময়ই সৌরশক্তি আবদ্ধ হয়েছে জৈব পদার্থের মধ্যে।

সূর্যের আলো ছাড়া সবুজ উদ্ভিদ বাঁচে না। সবুজ উদ্ভিদের জীবনে আলোর প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করবার জন্য দুটি পরীক্ষা করা যেতে পারে। কোন মাঠ বা বাগানের মধ্যে যেখানে সতেজ, সবুজ ঘাস আছে এমন একটি স্থান পছন্দ কর। ঐ ঘাসের ওপর একটি খালি মাটির টব উপুড় করে ঢাকা দাও, টবের পেছনে যে ছোট গর্ত আছে তা তুলো দিয়ে ভাল করে বন্ধ করে দাও। এই তুলোর মধ্য দিয়ে বাতাস যাবে কিন্তু আলো যাবে না। টবের যে মুখ মাটির সঙ্গে মিলেছে তার চারপাশ মাটি দিয়ে ভাল করে বন্ধ করে দাও। লক্ষ্য রাখ, টবের মধ্যে যে ঘাসগুলি ঢাকা পড়েছে তারা যেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকে। এইভাবে দু' সপ্তাহ ধরে টবটি রেখে দাও। প্রতিদিন সামান্য পরিমাণে জল টবের চারপাশে ছিটিয়ে দাও, টবের মধ্যকার ঘাসগুলি ঐ জল মাটি থেকে পোষণ করে নেবে। দু' সপ্তাহে পরে টবটি খুলে দেখ, অন্ধকারে রাখা ঘাসগুলির অবস্থা কি হয়েছে এবং তার চারপাশে মুক্ত আলোয় বেড়ে ওঠা ঘাসগুলিরই বা কি অবস্থা হয়েছে। পরস্পরের অবস্থার পার্থক্য তুলনা কর। ওদের রং লক্ষ্য কর, দৈর্ঘ্যের পরিমাপ নাও। লক্ষ্য কর অন্ধকারে ওরা কেমন হলদে হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে, অন্ধকারে ওরা কিছুই খাবার তৈরি করতে পারেনি। এইভাবে আরো কিছুদিন রাখলে ঘাসগুলি শুকিয়ে মরে যাবে।

এই পরীক্ষা ঘাসের বদলে বাগানের দুটি ছোট চারাগাছ নিয়েও করা যায়। চারাগাছ দুটি একই জাতের ও একই বয়সের হওয়া চাই। একটি চারাগাছ পূর্বের মত টব দিয়ে ঢাকা দেবে, অন্যটি আলোয় বাড়তে দেবে। দু' সপ্তাহ পরে টবটি খুলে দুটি চারাগাছের দৈর্ঘ্যে, কাণ্ডের পরিধি, পাতার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, পাতার সংখ্যা, রং এবং দুটি গাছ মাটি থেকে তুলে ওজন নিয়ে পরীক্ষা করে দেখ, একটি খাতায় পরীক্ষার বিবরণ লেখ এবং পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করে তোমার মন্তব্য লেখ।

সংশোধন

জুন সংখ্যায় জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ লেখার ১৪ পাতার ২য় কলমের শেষে 'ওজন করে হাতের উপরে'র পরিবর্তে 'ছাতের উপরে' পড়তে হবে।

মাছরাঙা পাখিদের কথা

অজয় হোম

গুড়িয়াল

বর্ষাকালে ছুটির দিনে পাখি লক্ষ্য করতে শিবপুরে বটানিকসেই বেশি যাই। সেদিন সকালে বাস থেকে নেমে ধরেছি গঙ্গাকে বাঁয়ে রেখে যে রাস্তা গেছে সেটাকে। খুবই নির্জন। এসময় লোকজন প্রায় থাকে না বললেই চলে। চলেছি। দুদিকে গাছের বেশ ঘন সমাবেশ। ডানদিকে গাছপালার মাঝে বড়ো লম্বাটে ডোবা। হঠাৎ বাঁ পাশে গাছপালার ভিতর থেকে কর্কশস্বরে ভুতুরে গলায় 'কেএ-কে কে-কে…'আওয়াজে চমকে উঠে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পড়লাম। প্রথম 'কে-এ'-টা হঠাৎ এত জোর যে এই নির্জন পরিবেশে গাটা ছমছম করে উঠল মুহূর্তের মধ্যে। তারপরেই দেখলাম চোখের উপর দিয়ে উড়ে গেল রঙ্গরাঙা বড় চঞ্চুওয়ালা নীল গা ফিকে বাদামী মাথা এক পাখি 'কেএ-কে-কে ..' ডাকতে ডাকতে। বসল গিয়ে ডোবার কিনারার পাতার আড়ালে একটা গাছে।

পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছি পাখিটা কি করে। আরও কাছে যাবার ইচ্ছে থাকলেও সেটা সম্ভবপর নয়, কারণ পাখিটা ডোবার ওপারে পাতার আড়ালে। পাখিটা ওখান থেকে উড়ে অন্য কোথাও যায়, না মাছ ধরে তাই লক্ষ্য করার জন্যে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে চললাম। আধ ঘন্টাটাক হবে নিশ্চয়ই, বেশিও হতে পারে, জলের উপর ঝুঁকে পড়া ডাল থেকে ঝপ্ করে জলে পড়ে পাশের আর-একটা গাছের পাতার আড়ালে চলে গেল। এত ত্বরিংগতিতে ঘটনাটা ঘটল যে মাছ ধরল কিনা বুঝতে পারলাম না। অল্প পরেই পাখিটা ভুতুড়ে 'কেএ-কে-কে…'ডাকতে ডাকতে চলে গেল সম্পূর্ণ উলটো দিকে।

পাখিটা মৎস্যরঙ্গ বংশের অন্তর্গত বকচুঞ্চী গণের (পেলারগপসিস্) এক প্রজাতি; নাম—গুড়িয়াল, ঢোঁসা (পেলারগপসিস্ ক্যাপেনসিস্)। হিন্দি—বড়া কিলকিলা, বাদামী কৌরিলা। ইংরেজি—স্টর্কবিলড্ কিংফিশার, ব্রাউনহেডেড স্টর্কবিল্ড কিংফিশার।

গুড়িয়াল বা ঢোঁসা চঞ্চু সমেত লম্বায় ১৫ ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথা ঘাড় ও মাথার দু' পাশ গাঢ় পাটকিলে; পিঠ ডানা ও লেজ সবজেটে-নীল, সবুজের ভাগটাই বেশি। চিবুক ও গলা সাদাটে, বাকি তলার পালক পাটকিলে হলুদ। কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল; চঞ্চু টুকটুকে রক্তরাঙা লাল, একদম ডগায় একটু কালোভাব; পা এবং আঙুল প্রবাল লাল।

গুড়িয়াল

বাসস্থান—ভারত, বাংলাদেশ থেকে ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া, সুন্দা ফিলিপাইন, সেলিবিস, সুলা দ্বীপপুঞ্জ। ভারতে ২টি প্রজাতি। প্রথম প্রজাতির ৩টি উপজাতি। প্রথম (পে কা ক্যাপেনসিস্)—উত্তরপ্রদেশ থেকে হিমালয়ের নিম্নাংশ ধরে নেপাল, আসাম, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ থেকে খান্দেশ, দক্ষিণে মহীশূর, মাদ্রাজ, কেরালা এবং শ্রীলঙ্কায়। দ্বিতীয় (পে কা অসমাস্টোনি)—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। তৃতীয় (পে কা ইস্টারমিডিয়া)—নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। দ্বিতীয় প্রজাতি (পে আমাউরোপটেরা) 'বাদামী-ডানা ঢোঁসা,' ব্রাউন-উইংগড্ স্টর্কবিলড্ কিংফিশার—দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আসাম থেকে দক্ষিণে সমুদ্রতীরবর্তী

আরাকান, টেনাসেরিয়াম, মালয় উপদ্বীপ থেকে লাংকায়ি দ্বীপপুঞ্জে। লম্বায় ১৪ ইঞ্চি। সমুদ্র উপকূলের বাসিন্দা এবং লোনাজলই পছন্দ। লাল চঞ্চুটা একটু বেশি বড়ো।

স্বভাব—গুড়িয়াল বা ঢোঁসা জল এবং ঘন গাছপালার সমন্বয় এমন যে জায়গা তার অধিবাসী। জঙ্গলের মধ্যে গাছে ঢাকা ছোটো নদী, জঙ্গলের মাঝে ডোবা বা পুকুর, এমনকি জলা বা বাদার ধার পছন্দ করে বেশি। সেকারণে মরুভূমি সদৃশ অঞ্চলে এদের কখনও দেখা যায় না। সমুদ্রের ধারে খাড়ির আশেপাশেও দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণত জোড়েই থাকে কিন্তু দুজনে বেশ তফাতে বিচরণ করে। কেউ কারুর শিকারভূমির বিশেষ জায়গায় পদার্পণ করে না। একমাত্র এক স্থান থেকে অপর স্থানে যাবার সময় দেখা যায় দুজনে উড়ে চলেছে।

গুড়িয়ালকে দেখা যায় কম, ডাকই শোনা যায় বেশি। ভূতুড়ে কর্কশ প্রথম 'কেএ'-র উপর জোরটা দেয় বেশি, তারপর চলে 'কে-কে-কে…'। আপন মনে কোনও জায়গায় বসে যখন গলা ভাঁজতে থাকে—'পি-ই-র… পিইর…পার,' তখন সেটা শুনতে কিন্তু খারাপ লাগে না, একটু মধুরও।

জলের ধারে ঝুলেপড়া গাছের ডালে বা জলের কাছেই কোনও ঘন পাতা সমৃদ্ধ গাছের ডালে লুকিয়ে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কখন একটা মাছ জলের উপরে আসবে। দেখতে পেলেই হল, ঝাঁপিয়ে পড়বেই, তার জন্যে জলের মধ্যে ডুবে যেতে আপত্তি নেই কিন্তু ফিরবে যখন তখন মুখে একটা মাছ থাকবেই। ছোটো মাছরাঙা বা অন্যান্য মাছরাঙাদের মতো এরা জলের উপর উঁচুতে খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে তারপর সোজা ডাইভ খেয়ে কখনও শিকার ধরে না। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে এদের টেলিগ্রাফ তারের উপরও বসে থাকতে দেখা যায়।

গুড়িয়ালের ওড়াটা সোজাসুজি এবং দ্রুত। সময়ে সময়ে দেখা যায় এরা খুব লাজুক। মানুষ দেখলেই সরে পড়ে। আবার কখনও কখনও তাদের লক্ষ্য করছে দেখলেও ভ্রূক্ষেপ করে না।

প্রজননকাল জানুয়ারি থেকে জুলাই। কোথাও কোথাও আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গড়ায়। কখনও কখনও দুবার ডিম পাড়ে। নদীর ধারে খাড়া পাড়ে গর্ত খোঁড়ে ৪-ইঞ্চি চওড়া এবং ২-৩ ফুট লম্বা। গর্তের শেষে আস্তরণহীন ডিম্বঘর। ডিম পাড়ে ৪-৫টি গোলাকার চকচকে সাদা। স্ত্রী-পুরুষ ঘরগেরস্তালীর কাজে পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিমের মাপ—লম্বায় ১·৪৫, চওড়ায়১·২৩ ইঞ্চি।

কড়িকাটা

সেদিনও সিসিআর কাটিংএর সবচেয়ে বড়ো যে ঝিল তাতে মাছ ধরতে বসেছি। পিছনে রেল লাইনের উঁচু পাড়। এই ঝিলটা খুব পরিষ্কার, কোথাও হোগলা বা নলখাগড়ার ঝাড় নেই। মাছও বেশ বড়ো বড়ো ধরা পড়ে।

কড়িকাটা

তারই অন্তত একটির আশায় চার করে খুব ঝিমে টোপ ফেলে বসে আছি। দুপুর গড়িয়ে গেছে। চারে মাছ আছে, টোপের আশে পাশে ঘুরছে, অল্প চাপ দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছে। ছিপটি চেপে ধরে ফাতনার দিকে সমস্ত দৃষ্টি মন লাগিয়ে বসে আছি। এমন সময় কানে এল 'চির্‌রুক…চির্‌রুক…' ডাক। কর্কশ নয় বেশ জীবন্ত। যেখানে ঝিমে টোপ তার থেকে কিছু দূরে একটা কালো-সাদা জেব্রা পাখি উড়ে এসে জেল্লটাকে নিচু করে গলাটা বের করে নিচুদিকে ঝুঁকে দুই ডানা সজোরে ঝাপটে শূন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। প্রায় ২৫-৩০ ফুট উঁচুতে কালো-সাদা ডোরাকাটা পাখিটা লেজের উপর ভর

রত্ন

সঙ্কর্ষণ রায়

মণি মুক্তার আধার—পাহাড়

কবি মাইকেল মধুসূদন লিখেছিলেন :

"হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ..."

মধুসূদন এখানে রত্নরাজি অর্থাৎ মূল্যবান পাথরের কথা বলেন নি, বলেছেন বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে প্রচুর বিবিধ রত্নের কথা। আমাদের ভূতাত্ত্বিকদের মনে কিন্তু এই কবিতা পশ্চিমবাংলার ভাণ্ডারে সত্যিই কোন রত্ন আছে কিনা এ প্রশ্ন জাগায়।

এই প্রশ্নের জবাব অবশ্য কোন ভূতাত্ত্বিক দিতে পারবেন না, কারণ পশ্চিমবাংলায় রত্ন-পদবাচ্য পাথরের সন্ধান ভূতাত্ত্বিকরা বিশেষ পান নি। সন্ধান তাঁরা পাননি বলে পশ্চিমবাংলাকে রত্নহীন মনে করা উচিত নয়, কারণ ঠিকমত সন্ধান চালিয়ে গেলে খুব দুর্লভ বস্তুও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান রত্ন, অর্থাৎ উপরত্নের হদিস এ রাজ্যে অবশ্য বহুকাল আগেই মিলেছে। তবে তাদের দিকে ভূতাত্ত্বিকরা ভালোভাবে মনোনিবেশ করেন নি। যেমন ধরুন গারনেট (garnet) বা তামড়ি। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার বহু নদীনালার বালির মধ্যে গারনেট দেখা যায়। এই সব জেলা এবং দার্জিলিং জেলার মাইকা-সিস্ট-এর স্তরের মধ্যেও গারনেট দেখা যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে স্বচ্ছ রক্তবর্ণের রত্নশ্রেণীর গারনেট আছে কিনা তার সন্ধান নেওয়া হয়নি, কারণ রত্নশ্রেণীর গারনেট তেমন কিছু মূল্যবান নয়।

কিন্তু মূল্যমানের দিক থেকে যাই হোক না কেন গারনেট সুদূর প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মন মজিয়েছে। 'Garnet' শব্দটি এসেছে 'pomegranate' শব্দ থেকে। প্রায় ডালিমের দাগের মত দেখতে বলে গারনেট-এর এই নামকরণ হয়েছিল। প্লিনির রচনায় গারনেট দিয়ে তৈরি পানপাত্রের উল্লেখ আছে। পানপাত্রের মত অন্যান্য জিনিসও নিশ্চয়ই তৈরি করা হত গারনেট দিয়ে। গারনেটের এই প্রাক্তন জনপ্রিয়তা এখন কমে গেলেও রত্ন হিসেবে তার ব্যবহার এতটুকু কমেনি। তবে তার জন্য চাই রক্তবর্ণ স্বচ্ছ গারনেট। পশ্চিমবাংলার যে নদীনালা ও শিলাস্তরে গারনেট দেখা যায় তাদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে এ জাতীয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গারনেট খুঁজে বের করতে হবে।

গারনেট-এর মত আর একটা জিনিস পশ্চিম বাংলার নানা জায়গায় পাওয়া যায়—তা হচ্ছে স্ফটিক বা কোয়ার্টজ (quartz)। কোয়ার্টজাইট, কোয়ার্টজ-এর শিরা, গ্রানিট, বেলেপাথর প্রভৃতি পাথর ও বালির মধ্যে স্ফটিক প্রচুর পরিমাণে বিরাজ করছে বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার বহু জায়গায়। সাধারণ কোয়ার্টজ অবশ্য রত্নশিলা হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, তার জন্য চাই পরিপূর্ণ কেলাসিত (crystallised) স্ফটিক। এহেন কেলাসিত স্বচ্ছ স্ফটিক বিরল। তা পাওয়া যায় বীরভূম জেলার আগ্নেয়শিলার ভেতরকার গহ্বরে এবং বাঁকুড়া জেলার বালি-দমদম এবং মুক্তরা নুড়িতে অভ্রযুক্ত পেগমেটাইট-এর মধ্যে। এ হেন স্বচ্ছ সুন্দর স্ফটিকের সন্ধানের জন্য ভূতাত্ত্বিকদের তৎপর ও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন, কারণ রত্নশ্রেণীর কেলাসিত স্বচ্ছ স্ফটিকের যথেষ্ট সমাদর চলে আসছে সুদূর প্রাচীন কাল থেকে। প্রাচীন কালে স্বচ্ছ বর্ণহীন স্ফটিককে হীরে বলা

হত। স্বচ্ছ স্ফটিক দেখে মনে হয় যেন বর্ণহীন স্বচ্ছ জল পাথরে জমাট বেঁধেছে। স্ফটিকের গ্রীক প্রতিশব্দের অর্থ হল বরফ। জলের মত স্বচ্ছ স্ফটিকের জৌলুস কম বলে তাকে নিষ্প্রাণ পাথর বলা হয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ হলদে রঙের সংমিশ্রণ তাকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলে। কিঞ্চিৎ ম্যাঙ্গানিজ, টাইটানিয়াম বা লোহার সংমিশ্রণ স্ফটিকের রঙ হলুদ অথবা বেগনী ক'রে তোলে। এই হলদে বা বেগনী রঙের স্ফটিককে বলে জামীরা বা এ্যামেথিস্ট (amethyst)। এ্যামেথিস্ট-এর গ্রীক প্রতিশব্দের অর্থ হল 'যে মাতাল হয়নি।' গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল যে এ্যামেথিস্ট ধারণ করলে ঘোরতর মদ্যপও মাতাল হয় না; তাপ প্রয়োগ করলে এ্যামেথিস্ট-এর বেগনী বা হলুদ রঙ উঠে গিয়ে তাকে স্বচ্ছ ক'রে দেয়। রঙে স্থায়িত্ব না থাকলেও অবশ্য তা স্ফটিকের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম, জেলার বহু জায়গায় অভ্রযুক্ত পেগমেটাইট (pegmatite) গ্র্যানিট অথবা মাইকা-সিস্ট-এর স্তরকে বিদীর্ণ ক'রে অবস্থান করছে। এই সব পেগমেটাইট-এর মধ্যে জায়গায় জায়গায় সবুজ রঙের বেরিল (beryl) দেখা যায়। সবুজ বেরিল কদাচিৎ স্বচ্ছ রূপে বিরাজ করে—তার এই স্বচ্ছ রূপকে বলে পান্না (emareld)। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পান্না হীরের চেয়েও দামী হয়ে থাকে। পান্না সম্বন্ধে অনেক রকম সংস্কার আছে। পান্নার সবুজ রঙের এমনি শক্তি যে তা সাপের দৃষ্টি হরণ করে। আবার পান্নার সবুজে মানুষের চোখ জুড়ায়। নীরো নাকি পান্নার চশমা পরে গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াই দেখতেন। খৃস্টীয় নবম শতকে সেলাস লিখেছিলেন যে পান্না ব্যবহার করলে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানা রকম গুরুতর রোগ সেরে যায়।

এ হেন পান্না বেরিল এর পাশাপাশি থাকে বলে পেনমেটাইটগুলোকে ভালভাবে পরীক্ষা করা দরকার। পশ্চিমবাংলায় পান্নার অস্তিত্বের কথা এ পর্যন্ত কোন বিশেষজ্ঞ কল্পনা না করলেও এই অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া দরকার।

পশ্চিমবাংলায় যে সব রত্নভাণ্ডারের সম্ভাবনা আছে তাদের কথা লিখেছি। তা ছাড়া আরও দুটি জিনিসের কথা বলতে চাই। তাদের মধ্যে একটি হল স্বচ্ছ রত্ন শ্রেণীর এ্যাপেটাইট (apatite)। পুরুলিয়া জেলার এ্যাপেটাইট-এর ভাণ্ডারের মধ্যে তা প্রচ্ছন্ন। মালথল গ্রামে ব্যারাইট-এর (barite) শিরার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে এই স্বচ্ছ সবুজ এ্যাপেটাইট-এর কয়েকটি টুকরো। ভাল করে খোঁড়াখুঁড়ি করলে পুরুলিয়া জেলার এ্যাপেটাইট-এর সঞ্চয়ের মধ্যে হয়তো রত্নশ্রেণীর এ্যাপেটাইট খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

এ্যাপেটাইট-এর মত কায়ানাইট-এর- (kyanite) ব্যাপক সঞ্চয় আছে পুরুলিয়া জেলায়। কায়ানাইট-এর সঙ্গে কুরুবিন্দ বা কোরাণ্ডাম (corandum) নামক খনিজ পাওয়া যায়। শালবনীতে এ হেন কুরুবিন্দ পরীক্ষা করতে করতে প্রায় স্বচ্ছ নীলাভ কুরুবিন্দ দেখতে পেয়েছিলেন জনৈক ভূতাত্ত্বিক। পুরোপুরি স্বচ্ছ নিবিড় নীল রঙ-এর কুরুবিন্দই হল নীলা (saphire)। যাকে বলে 'নীলা' তার সাক্ষাৎ অবশ্য তিনি পাননি কিন্তু ঐ প্রায় স্বচ্ছ নীলাভ কুরুবিন্দ নীলার অস্তিত্বের সম্ভাবনার আভাস দিচ্ছে। কায়ানাইট-যুক্ত পাথরগুলোকে ভাল ক'রে পরীক্ষা করলে নীলার কোন একটা গুপ্ত ভাণ্ডার হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

"নীলা" যে কতখানি দামী পাথর তা সকলেই জানি আমরা। কুরুবিন্দের বিশুদ্ধ এ্যালুমিনাতে (Alumina) বিন্দু প্রমাণ টাইটানিয়াম-এর (titanium) সংমিশ্রণ কুরুবিন্দকে রূপান্তরিত করে নীলায়। রাসায়নিক বিচারে বিন্দুমাত্র টাইটানিয়াম-এর পার্থক্য, কিন্তু যে রূপান্তর ঘটে মূল্যমানের নিরিখে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই তার সমাদর। তাকে আমরা নীলকান্ত মণি বলেও জানি।

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন। মণি-রত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বজ্র মাণিক বা হীরা কি পাওয়া যায় পশ্চিম বাংলায়?

এ প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ ভূবিজ্ঞানীই বলবেন যায় না। এ রাজ্যের কোনো অঞ্চল থেকেই হীরে আহরণের কোন খবরই নেই। খবর না থাকলেও সম্ভাবনা নেই, একথা বলা চলে না।

সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। বিহারের পালামৌ জেলার শঙ্খ্ ও কোয়েল্ নদীর বালি থেকে প্রাচীন ও মধ্য যুগে হীরে আহরণ করা হত। এই বালির বিশেষত্ব হল, তার মধ্যে বিকীর্ণ হয়ে আছে স্বর্ণরেণু। অনুরূপ স্বর্ণমণ্ডিত বালি পুরুলিয়া জেলার নদীনালার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এই বালি ধুয়ে নিয়মিত সোনা বের করে স্থানীয় আদিবাসীরা। শঙ্খ্ ও কোয়েল নদীর বালির মত পুরুলিয়া জেলার নদী-নালার সোনা মেশানো বালির মধ্যেও হীরার অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে।

কাজেই অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে। আমার আন্তরিক বিশ্বাস, অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসন্ধান আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করবেই।

৮/এ পাইকপাড়া রো (দ্বিতল), কলিকাতা-৩৭

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কোহিমা থেকে ডিমাপুরে ফিরে উঠলাম সারকিট হাউসে। ইচ্ছে ছিল, সারকিট হাউসে দু'-একদিন কাটিয়ে ডিমাপুরের আশপাশ ঘুরে প্লেনে চেপে কাকার সঙ্গে ফিরে যাবো কলকাতা। কিন্তু তা' আর হ'লো না।

সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়া করে সবে নিজেদের ঘরে ফিরে এসেছি, এমন সময় দরজায় ঠক ঠক শব্দ।

কাকা দরজা খুলতেই আমাদের ঘরের বেয়ারা বলল, 'বোস সাব, আপকা টেলিফোন।'

কি ব্যাপার! এত রাতে আবার কে টেলিফোন করছে। আবার লাল সিংকে নিয়ে কোন ঝামেলা হলো নাকি!

'নাঃ, এরা দেখছি, আমাকে একদিনও নিশ্চিন্ত থাকতে দেবে না।'

সৃজন কাকা একটু চিন্তিত গলায় বলল, 'চল তো বাদল, দেখে আসি, এত রাতে আবার কে ফোন করছে।"

ঘুমে তখন আমার চোখ ঢুলুঢুলু। তবু চোখ কচলাতে কচলাতে কাকার সঙ্গে নিচে চললাম ফোন ধরতে।

'হ্যালো, সৃজন বোস স্পিকিং—'

ফোনের ও প্রান্ত থেকে গলা ভেসে এলো, 'মিঃ বোস আমি ডঃ ভাটনগর বলছি। আপনি কি চিনতে পারছেন আমাকে?

খানিকক্ষণ ভেবে উত্তর দিল কাকা, 'হ্যাঁ নিশ্চয়। আপনি দিল্লীর ডঃ ভাটনগর তো। বছর চারেক আগে বেনারসের সেমিনারে তো আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিন্তু আপনি কি এখন ডিমাপুরে—?'

"সে অনেক কথা। খুব বিপদে পড়েছি। ফোনে

সব বলা যাবে না। কাল সকালে আমার বাড়িতে একবার আসবেন? সকাল আটটা নাগাদ গাড়ি পাঠাব।'

কাকা আমার দিকে একবার তাকিয়ে জবাব দিল, 'ঠিক আছে। আটটা নাগাদ তৈরী হয়ে থাকব।'

ঘরে ফিরে কাকাকে বললাম, কী ব্যাপার। এখানেও আবার অ্যাডভেনচার নাকি!' ঘুমোতে যাবার আগে ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে ফুট-ফুটে জ্যোৎস্না। দূরে রহস্যময় নাগা পাহাড়; সামনে ধান-সিঁড়ি নদী জ্যোৎস্নার আলোয় দুধের নদী হয়ে কোথায় বয়ে চলেছে। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো, আবার কোন্ রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে কে জানে!

রাতে বিছানায় শুয়ে অজানা অ্যাডভেনচারের কথা ভাবতে ভাবতে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই।

পরের দিন সকালে সৃজনকাকার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

'তাড়াতাড়ি উঠে পড়, মিঃ ভাটনগরের বাড়ি যেতে হবে না?'

ঝটপট বিছানা থেকে উঠে দেখলাম, আমাদের ঘরটা সকালের রোদে ভরে গেছে। ব্যালকনি থেকে চোখে পড়ে, ধানসিঁড়ি নদী কুলকুল করে বয়ে চলেছে। দূরে নাগা পাহাড় ধূসর, রহস্যময়।

ঠিক সকাল আটটা নাগাদ একটা সবুজ রংয়ের জীপ এসে দাঁড়াল সার্কিট হাউসের সামনে। গাড়ির ড্রাইভার এক নাগা যুবক। পরে নাম জেনেছি, ইমতি আও। আমাদের দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল ইংরেজীতে, 'আপনি কি মিঃ সৃজন বোস? আমি ডঃ ভাটনগরের কাছ থেকে আসছি—'

কাকা বলল, 'চলুন—'

আমি আর সৃজন কাকা জিপে চড়ে বসলাম। আমাদের সঙ্গে কাকার সেই বিখ্যাত বাক্স। আমরা যেখানেই যাই না কেন, কাকার এই বাক্সটি থাকবেই। এতে আছে বেশ কিছু ম্যাপ, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, চুম্বক, নানা ধরনের কেমিক্যাল সলিউশন, খুব ছোট সাইজের জাপানী মাইক্রোস্কোপ, আমেরিকান হাতুড়ি, ধারালো ছুরি, শক্ত নাইলন কর্ড, পকেট ট্রানজিস্টর-কাম টেপ রেকর্ডার, ছোট জাপানী ওয়াকি-টকি ইত্যাদি হাজার রকমের জিনিস। কিন্তু এত জিনিস থাকা সত্ত্বেও বাক্সটা তেমন ভারী নয়। দশ-বারো কেজির বেশি হবে না।

ডিমাপুর শহর ছাড়িয়ে বোকাজানের রাস্তায় একটা পাঁচিল ঘেরা বাড়ির সামনে এসে থামল আমাদের জিপ। জিপ থামবার একটু পরেই লোহার দরজা খুলে দিল দারোয়ান। আমাদের জিপ ভেতরে গিয়ে একটা দোতালা বাড়ির সামনে থামলে আমরা জিপ থেকে নামলাম।

আমাদের জন্য আগে থেকে অপেক্ষা করছিলেন ডঃ ভাটনগর। সৌম্যদর্শন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। লম্বায় প্রায় পৌনে ছ'ফুট। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। বয়স পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে।

ডঃ ভাটনগর আমাদের দেখে মৃদু হাসলেন, 'হ্যালো 'হ্যালো মিঃ বোস। ওয়েলকাম টু মাই কটেজ'।

কাকা আর ডঃ ভাটনগর দুজনে করমর্দন করলেন।

কাকা আমার সঙ্গে ডঃ ভাটনগরের পরিচয় করিয়ে দিল।

'এটি আমার ভাইপো বাদল। আমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে।'

'খুব ভালো, খুব ভালো। বেড়ানোর পক্ষে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না। যে ক'দিন এখানে থাকবেন সে ক'দিন আমার এখানেই থেকে যান।'

'কোন আপত্তি নেই, তবে আমাদের জিনিসপত্র যে সার্কিট হাউসে থেকে গেছে।'

'সেজন্য কোন অসুবিধে নেই। আমার ড্রাইভার না হয় আপনাদের জিনিসপত্র সার্কিট হাউস থেকে নিয়ে আসবে।'

ঘাড় নেড়ে সৃজনকাকা বললেন, 'এবার আপনার সমস্যাটা বলুন। আপনার বিপদ—'

'হ্যাঁ, বলব। সবই বলব আপনাকে। সে সব বলবার জন্যই তো এখানে এনেছি। আমার কী ভাগ্য যে ঠিক সময়েই আপনি ডিমাপুরে ছিলেন।'

কিন্তু আমি যে এখানে আছি, সেকথা কে বলল আপনাকে? সৃজনকাকার চোখেমুখে বিস্ময়।

'বাঃ, সেকথা এখানকার কে না জানে। ইম্ফল রেডিয়ো স্টেশন থেকেই তো সেদিন আপনার সম্বন্ধে বলল। আপনি শোনেন নি।'

'না, খবরটা তাহলে মিস করেছি।' সৃজনকাকা হাসল। কথা বলতে বলতে বাড়ির ভিতরে একটা ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ডঃ ভাটনগর বললেন, এটা আমার ল্যাবরেটরী। বসুন, এখানেই বসা যাক। এখানে বসেই না হোক গল্প-সল্প হবে।

ল্যাবরেটরিটি আকারে বিশাল। নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, দেয়ালে অনেক রঙিন চার্ট। সবকিছু আমার ঠিক হৃদয়-ঙ্গম হচ্ছিল না।

একটু পরে একটি নাগা মেয়ে এসে আমাদের সামনে সকালের জলখাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। ওমলেট টোস্ট সন্দেশ আর চা। সকালে আমরা খেয়ে আসতে পারি নি, তাই বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। খেতে খেতে আমাদের গল্প শুরু হলো আবার। নিজের কথা বলতে শুরু করার আগে ডঃ ভাটনগর একবার তাকালেন আমার দিকে।

ডঃ ভাটনগরের মনের কথা বুঝতে পেরে কাকা বলল, 'সংকোচের কিছু নেই ডঃ ভাটনগর। ও আমার অ্যাসিস্টেনটের মতো। ওর সামনে সবকিছু বলতে পারেন।'

ডঃ ভাটনগরের সংকোচ কেটে গেল। উনি বললেন, 'জানেন পরশু রাতে আমার ল্যাবোরেটারি থেকে পাঁচটা ডিম চুরি গেছে। এই ডিম চুরির রহস্য আপনাকে ভেদ করতে হবে—'

আমি সৃজন কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, ওর মুখ গম্ভীর। কাকার নানা রকম মুডের সঙ্গে আমি খুবই পরিচিত। আমার বুঝতে কোনও অসুবিধা হলো না, ডঃ ভাটনগরের কথায় কাকা বেশ চটে গেছে। আর চটে যাবারই কথা। সৃজনকাকার মতো এমন একজন ভারত বিখ্যাত বিজ্ঞানী গোয়েন্দাকে কিনা ডিমচুরির রহস্য ভেদ করতে হবে। ডিম-চুরির রহস্য কাকা নয়, আমিই করতে পারি এই মুহূর্তে। ডঃ ভাটনগরের রাধুঁনি নির্ঘাত ডিমগুলি দিয়ে ওমলেট বানিয়ে খেয়েছে, আর এখন দোষ চাপাচ্ছে চোরের ঘাড়ে।

ডঃ ভাটনগর বোধহয় আমাদের মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মুচকি হেসে বললেন, 'মিঃ বোস কিছু মনে করবেন না। এই ডিম কিন্তু খাওয়ার ডিম নয়। হাঁসের ডিমের মতো দেখতে এই ডিম আসলে সোলার ফুয়েল। কয়েকটি জটিল রাসায়নিক জিনিস দিয়ে এই ডিমগুলো তৈরি করেছি ল্যাবোরেটরীতে। তারপর বিশেষ পদ্ধতিতে এই ডিমগুলির সঙ্গে সূর্যরশ্মির বিক্রিয়া ঘটিয়েছি ল্যাবেরোটরিতে। এই বিক্রিয়া ঘটাতে সময় লাগে সাত থেকে দশ দিন।' এইরকম একটি ডিম দিয়ে ছোট সাইজের একটা এরোপ্লেন চালানো যাবে অন্তত ঘণ্টা পাঁচেক।'

ডঃ ভাটনগরের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ বলে উঠল সৃজনকাকা, 'সত্যি! আপনি তো অসাধ্য সাধন করেছেন। কিন্তু এসব ফরমূলা আপনি কোথায় পেলেন? এ কি আপনার নিজের নাকি কারো কাছ থেকে পেয়েছেন?'

কাকার এ প্রশ্নে ডঃ ভাটনগর যেন একটু চটে গেলেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই সামলে নিলেন নিজেকে। তিন-চার মিনিট চুপ করে থেকে আবার শুরু করলেন ডঃ ভাটনগর।

'আপনি তো জানেনই সারা পৃথিবীময় এখন জ্বালানীর দুর্ভিক্ষ চলছে। যা কিছু সামান্য পেট্রোলিয়াম আছে, তা' শেষ হতে আর ক'দিন! তাই আমি গবেষণা করছিলাম কি-ভাবে সূর্যের শক্তি আমাদের কাজে লাগানো যায়। কিন্তু সবকিছু যখন প্রায় করে এনেছিলাম, তখনই এই সর্বনাশ—'

ডঃ ভাটনগর হঠাৎ যেন ভেঙ্গে পড়লেন। দুঃখে হতাশায়।

সৃজনকাকা বলল, 'কিন্তু তাতে আপনার চিন্তা কি! আপনার কাছে তো সূর্য-ডিমের ফরমূলা আছে। সেই ফরমূলা থেকে আবার তৈরী করুন সূর্য-ডিম।'

'তা থাকলে তো হতোই। কিন্তু চোরেরা আমার ফরমূলা সুদ্ধ চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'অবাক কাণ্ড! তা'হলে তো মনে হচ্ছে, এ আপনার ল্যাবরেটরির ভেতরের কারো কাজ।'

'তা মনে হয় না। কারণ আমার ল্যাবরেটরিতে আমি একলাই কাজ করি। তবে মাঝে মাঝে একটু আধটু সাহায্য করে ড্রাইভার ইমতি আও। আর ওর বউ লিলি আমাদের সকলের জন্য রান্নাবান্না করে। এরা ছাড়া বাইরের লোক আমার কাছে ক্বচিৎ কদাচিৎ আসে। কারণ আমি পাবলিসিটি একদম পছন্দ করি না। ইচ্ছে ছিল, সূর্য-ডিমের ব্যাপারটা সফল হলে সায়েন্টিফিক আমেরিকানে প্রবন্ধ পাঠাব। ওদের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে সব পাকা করে ফেলেছিলাম।'

'তাহলে মনে হয় আপনার ওই চিঠির সূত্র ধরে কোনো যশোলোভী বৈজ্ঞানিক হয়তো—'

তা মনে হয় না। তবে কে জানে—, স্বগতোক্তির মতো বলেন ডঃ স্বরূপ ভাটনগর।

ডঃ ভাটনগরের ল্যাবেরেটরির মধ্যে এক জায়গায় দেখলাম একটা বেশ বড় প্রিজম। তার ভিতর থেকে নানা রংয়ের বর্ণালি ফুটে বেরোচ্ছে।

ডঃ ভাটনগর বললেন, 'এখানে প্রিজমের মাধ্যমে সূর্যরশ্মি দিয়ে ডিমের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাতাম।' সৃজনকাকা আর আমি মনোযোগ দিয়ে প্রিজমটা দেখলাম। ওর মাথার উপরে অর্ধ-গোলাকার কাচের ঢাকনা, যার ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মি ঢুকছে ল্যাবোরেটরীর ভেতরে।

ডঃ ভাটনগর আমাদের বুঝিয়ে বললেন, কী করে ল্যাবরেটরির ভেতরে সূর্যের আলো রাসায়নিক ডিমের ভেতরে ঘনীভূত করা হয়। এই সূর্য-ডিম দিয়ে যেমন পেটরোলের কাজ চলে, তেমনি প্রয়োজন এ থেকে

বিদ্যুৎ তৈরী করা যাবে। তবে বিদ্যুৎ তৈরীর প্রক্রিয়াটি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে ছিল। আর কিছুদিন গবেষণা করলেই উনি পদ্ধতিটি নিখুঁত করে তুলতে পারতেন। কিন্তু তার আগেই এই চুরি।

ডঃ ভাটনগরের কথা-বার্তা শুনে ও ল্যাবোরেটরী ঘুরে দেখে ও'র ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল। ডিমাপুর শহরের এক প্রান্তে বসে মানুষের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কী গভীর নিষ্ঠায় গবেষণা করে যাচ্ছেন। কলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজের মানুষজন বোধহয় ডঃ ভাটনগরের এই গবেষণার খবরও রাখে না। সৃজনকাকার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, ল্যাবোরেটরির সবকিছু খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, কিন্তু কোন মন্তব্য করছে না।

ল্যাবোরেটরি দেখা হয়ে গেলে ডঃ ভাটনগর বললেন, 'আপনারা এখন বিশ্রাম করুন, স্নান করে খেয়ে নিন। পরে বিকেলে আবার আলোচনায় বসা যাবে। চলুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে আনি।'

ল্যাবোরেটরির ওপরে ছাদ। সেই ছাদের একপাশে গোটা তিনেক ঘর। ওর মধ্যে পুবের ঘরে থাকেন ডঃ ভাটনগর নিজে। বাকি দু'টো বোধ হয় গেস্ট রুম। নিচে থাকে সস্ত্রীক আও আর দারোয়ান। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও নিচে। পশ্চিমের ঘরের দরজাটা ভেজানো।

ডঃ ভাটনগর দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'এই-ঘরটা আপনাদের জন্য। যে ক'দিন ডিমাপুরে থাকবেন, এখানেই থাকুন। কোন কিছু প্রয়োজন হলে কলিংবেল টিপবেন। লিলি আপনাদের জন্য সবকিছু বন্দোবস্ত করে দেবে।'

ঘরে ঢুকে আমরা তো অবাক, ড্রাইভার ইমতি আও এরই মধ্যে আমাদের সব জিনিসপত্র সারকিট হাউস থেকে এনে রেখেছে। ঘরটাও বেশ ভালো, মোজেক করা। দু'টো খাট টেবিল চেয়ার, ওয়ার্ড-রোব সব কিছু পরিপাটি করে সাজানো। সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। সবই ভালো, কিন্তু ডঃ ভাটনগরের সারা বাড়িতে একটা অদ্ভুত গন্ধ। এ গন্ধ আগে কখনো পাই নি। স্নান-টান করে দুপুরে খাওয়া দাওয়া ভালোই হলো। ভাত, ডাল, নদীর টাটকা মাছ, দই। দুপুরে খাওয়ার পর আমার চোখ ভেঙ্গে আসছিল ঘুমে। সৃজন কাকা বলল, 'কি বাদল, বাইরে থেকে আমার সঙ্গে ঘুরে আসবি নাকি?'

আমি বললাম, 'না কাকা, তুমি যাও। আমি বরং একটু ঘুমিয়ে নিই।'

কাকা বেরিয়ে গেলে দরজা ভেজিয়ে ঘুম লাগালাম আমি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি খেয়াল নেই। বিচ্ছিরি এক স্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে উঠে দেখি, আমাকে ধাক্কা দিয়ে ডাকছেন ডঃ ভাটনগর।

'কি ব্যাপার বাদল, তোমার কাকা কোথায়? কোথাও বেরিয়েছেন নাকি?'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, কী একটা কাজে বেরিয়েছেন। এক্ষুনি ফিরবেন নিশ্চয়ই।'

কিন্তু কাকার ফিরতে অনেক রাত হলো। কাকা যখন ফিরল, দেখি, কাকার চেহারা ঝড়ো কাকের মতো। সারা শরীরে ধুলো মাখা।

কাকা জিজ্ঞেস করল, 'ডঃ ভাটনগর কোথায়?'

'বোধ হয় নিজের ঘরে।' কিন্তু তুমি গিয়েছিলে কোথায়?'

'বলছি। তার আগে দরজাটা ভেজিয়ে দে।'

ঘরের দরজা ভেজিয়ে বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এলো কাকা।

পকেট থেকে এক গাদা কাগজপত্র বের করে সেগুলো খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। ক্লান্ত হলেও কাকার চোখ মুখ খুব উজ্জ্বল। কাগজপত্র দেখতে দেখতে একবার মুখ তুলে বলল, বুঝলি, দুপুরে এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে গিয়েছিলাম মিঃ বরগোহাঁইয়ের কাছে। উনি এখানে পি টি আইয়ের করেসপনডেন্ট—'

'মানে খবরের কাগজের লোক—'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সাদা ডিমের সঙ্গে ওদের কী যোগ?'

কাকা মুচকি হেসে বলল, 'হ্যাঁ আছে। নাহলে আর গিয়েছি কেন?' তোর মনে আছে, দু'তিন মাস আগে কাগজে খবর বেরিয়েছিল, ডিমাপুর অঞ্চলে বেশ কয়েকবার ফ্লাইং সসার দেখা গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে। কিন্তু এসবের সঙ্গে ডঃ ভাটনগরের সম্পর্ক কী তা' তো কিছু ছাই বুঝতে পারছি না।' আমি একটু অধৈর্য হয়ে পড়ি।

'আসলে কী ব্যাপার জানিস। ওর ল্যাবোরেটরিতে ঢুকেই একটা র‍্যাকে সাজানো দেখলাম, ফ্লাইং সসারের ওপর বেশ কয়েকটা বই। ব্যাপারটা দেখে কেমন একটা খটকা লাগল। যে লোক সোলার এনারজি বা সূর্য-শক্তির ওপর গবেষণা করছে, তার ল্যাবোরেটরিতে ফ্লাইং সসারের ওপর এতগুলি বই কেন। অবশ্য এতে অবাক হওয়ার তেমন কোন কারণ নেই। তবু আমার কিন্তু কিন্তু লাগছিল। হঠাৎ মনে পড়ল, ডিমাপুরের আকাশে বেশ কয়েকবার ফ্লাইং সসার দেখতে পাওয়ার কথা।'

'তাহলে কি তুমি বলছ, ফ্লাইং সসারের লোকগুলোই ডঃ ভাটনগরের ডিম চুরি করে নিয়ে গেছে?'

'হতে পারে। তবে ইমতি আও লোকটা সুবিধের নয়। ওর নাম আছে পুলিশের খাতায়।'

'তাই নাকি!' আমি খানিকটা অবাক হই, কারণ লোকটাকে দেখে বেশ ভালো লোক বলেই মনে হয়।

কাকা বলে চলে, 'মিঃ বরগোঁহাইয়ের কাছে শুনলাম, মাস দু'য়েক আগে নাকি ডিমাপুরেই একটা ফ্লাইং সসার নেমেছিল।' আমি বলি, 'সত্যি!'

'সত্যি মিথ্যে জানি না। তবে ডিমাপুরের এক বুড়ো কাঠুরে নাকি দেখেছিল, ডঃ ভাটনগরের বাড়ির পাশের মাঠে একদিন সন্ধেবেলা একটা ফ্লাইং সসার নেমেছিল। মিঃ বরগোঁহাইকে সঙ্গে নিয়ে আজ ঐ বুড়ো কাঠুরের সঙ্গে দেখা করি। বুড়ো কাঠুরে আমাকে বলল, ও নাকি পাশের জঙ্গলের ভেতরে থেকে দেখেছে, ফ্লাইং সসারটা দেখতে অনেকটা চ্যাপটা লাট্টুর মতো। সেই লাট্টুর ভেতর থেকে দু'টো লোক নেমে ডঃ ভাটনগরের বাড়ির দিকে হাঁটছিল। ওদের হাতে নাকি সাদা রংয়ের কয়েকটা জিনিস ছিল।'

'সাদা ডিম নাকি!'

'হয়তো তাই হবে। আসল ব্যাপারটা কি জানিস! মনে হয় রেডিয়ো সিগনালিং করে ঐ ফ্লাইং সসারটাকে আকাশ থেকে নামিয়েছে ডঃ ভাটনগর। রেডিয়ো সিগনালিংয়ের কাজটা ভালোই জানে ভাটনগর।'

'কিন্তু ভেতরের লোক দু'টো?'

'আরে ওরা কি আর মানুষ নাকি? ওরা তো রোবট। ঐ রোবটগুলোর কাছ থেকে রেডিয়ো-সিগনালিং করে হাতিয়ে নিয়েছিল ঐ সূর্য-ডিমগুলো। ভেবেছিল, ঐ ডিমগুলো দিয়ে পৃথিবী জোড়া নাম কিনবে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি। চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছে। পরশু রাতে ওর ল্যাবোরেটরি থেকে ডিমগুলো সরিয়েছে—'

কাকা কথা শেষ করবার আগেই দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে কে একজন ঢুকে পড়ল।

ভালো করে ঠাহর করে দেখি, ইমতি আও। ওর হাতে উদ্যত রিভলভার।

ওর মুখ গম্ভীর, ভয়ংকর। জড়ানো ইংরেজিতে বলল, ইমতি আও, 'মিঃ বোস আপনি একটু বেশি জেনে গেছেন। সুতরাং—'

এদিকে ঘরের মধ্যে সেই গন্ধটা তীব্রতর হয়ে উঠছিল। বিশেষত ইমতি আওয়ের শরীর থেকেই গন্ধটা যেন বেশি আসছিল।

একটু পরেই অবাক কাণ্ড। আমাদের দিকে রিভলভার তাক করে থাকতে থাকতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল আও। সেই তীব্র গন্ধে আমারও মাথা ঝিম-ঝিম করছিল।

মিঃ বোস, আপনি একটু বেশী.....

কাকা বলল, 'চল, শিগগির। তাড়াতাড়ি এ বাড়ি থেকে পালাতে হবে। না হলে আমাদের অবস্থাও হবে ইমতি আওয়ের মতো। সেই ডিমগুলির কেমিক্যাল রিয়াকশন শুরু হয়ে গেছে।'

কোন রকমে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ছুটলাম নিচের দিকে। যাবার আগে দেখলাম, ডঃ ভাটনগরের ঘরে তালা দেওয়া। তবে কি ভাটনগর ঘরে তালা দিয়ে বাইরে কোথাও গেছেন। নাকি ওকে তালা দিয়ে বন্দী করে রেখেছে ইমতি আও। কিন্তু তখন আর এতকিছু ভাববার সময় নেই। বাড়িময় তীব্র গন্ধে সমস্ত চেতনা যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি ছুটে বাড়ির বাইরে গিয়ে সবে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় সমস্ত বাড়ি জুড়ে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

শিউরে উঠে সৃজন কাকার দিকে তাকালাম। উঃ, আর একটু হলেই পুড়ে মরতাম আমরা।

একটু পরেই হেডলাইট জ্বালিয়ে পুলিশের জিপ এসে থামল। জিপ থেকে নামলেন পুলিশের এক অফিসার, জনা কয়েক কনেস্টবল আর এক ভদ্রলোক।

সেই ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে সৃজন কাকা বলল, 'আসুন মিঃ বরগোঁহাই, ঠিক সময়ে এসেছেন।

বুঝলাম, ইনিই মিঃ বরগোঁহাই, পি টি আই করেসপনডেণ্ট। পুলিশ অফিসার মিঃ আঙ্গামি বললেন, 'ইমতি আও কোথায়? ওর বিরুদ্ধে অনেক চার্জ।'

কাকা হাত উঁচু করে বাড়ীর দিকে দেখালেন।

পরের দিন বিকেলে ডিমাপুরের সারকিট হাউসে বসে সকলের সঙ্গে গল্প হচ্ছিল।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল সৃজন কাকা, 'ডঃ ভাটনগর জানতেন না যে সাদা ডিমগুলি চুরি করেছে ওরই ড্রাইভার-কামঅ্যাসিসট্যাণ্ট ইমতি আও আর ওর বউ লিলি। বেচারারা জানত না, ওই বিশেষ ডিম রাখতে হয় বিশেষ এক মাধ্যমের ভেতরে। কিন্তু ওরা ডিমগুলো রেখেছিল বাড়ীর নীচে একটা বাক্সের ভেতরে। খোলা হওয়ায় ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ডিমগুলো ফেটে গিয়ে সারা বাড়ীতে আগুন লেগে গেছে। অতি লোভ করতে গিয়ে ইমতি আওকে পুড়ে মরতে হলো।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ডঃ ভাটনগরের কী হলো? উনি কি বেঁচে গেছেন?'

হতাশ ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন মিঃ বরগোঁহাই, 'উনি কি আর বেঁচে আছেন? উনিও নিশ্চয়ই পুড়ে মরেছেন ইমতি আওয়ের মতো। বড় ভাল লোক ছিলেন ডঃ ভাটনগর।'

কিন্তু এমন সময় আমাদের সবাইকে অবাক করে ঘরে ঢুকলেন ডঃ ভাটনগর।' ওর সারা শরীরে ব্যানডেজ। এখানে ওখানে ফোলা।

ডঃ ভাটনগর বললেন, মিঃ বোসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। সবে খাটের উপর শরীরটা এলিয়ে দিয়েছি· এমন সময় দরজা খুলে হঠাৎ ভেতরে এলো ইমতি আও। হাতে উদ্যত রিভলভার। মাতালের মতো টলছে। ওর ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, আমার ল্যাবোরেটরি থেকে ডিম সরিয়েছে কারা! আমার এতদিনের বিশ্বস্ত লোক লোভে পড়ে কেমন বদলে গেছে। কিন্তু এরই মধ্যে আমাকে বাঁধতে শুরু করেছে আও। ওর হাতে রিভলভার, ওর সঙ্গে পারব কি করে! যাতে আমি চিৎকার না করতে পারি, তাই ঘরে তালা দিয়ে যাওয়ার আগে আমার মুখে গুঁজে দিয়ে গেল কাপড়। পরে বাড়ীতে আগুন লেগে গেলে হঠাৎ শরীরে এসে গেল অসুরের শক্তি। দরজা ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে বাঁচলাম। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, নিজে বাঁচলেও আগুন থেকে আমার ল্যাবোরেটরি বাঁচাতে পারলাম না। ভিনগ্রহের ঐ ডিমগুলো যে এত ভয়ংকর,, তা' আমিও বুঝতে পারি নি।'

হঠাৎ আমরা শুনতে পেলাম, বাইরে তীক্ষ্ণ শিসের মতো আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম, নীল আকাশের বুক চিরে দ্রুত উড়ে যাচ্ছে একটা হলুদ রংয়ের লাট্টু।

উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে ফ্লাইং সসারের দিকে চেয়ে রইলেন ডঃ ভাটনগর। আমি মন্তব্য করলাম, 'বোধহয় হারানো ডিমগুলোর খোঁজে ফিরে এসেছে উড়ন্ত চাকি।"

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া, ননগ্রীম হিল,
শিলং-৭৯০০০৩।

পুজো সংখ্যায় তিনটি
উপন্যাস লিখবেন
সমরজিৎ কর ॥ অদ্রীশ বর্ধন ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

ধাতু সম্মেলন

পার্থসারথি চক্রবর্তী

সভাপতি ইউরেনিয়ামের অনুমতিক্রমে শুভ্রকায় টিন উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দেহ কাঁপিতেছিল। তাড়াতাড়ি লোহ ও তাম্র আসিয়া তাহাকে আশ্রয় দিল। টিন বলিতে আরম্ভ করিলেঃ মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্রবৃন্দ,

পিছন হইতে এই সময়ে কাহারা জোর গলায় বলিলঃ লাউডার, লাউডার!

ঝাঁঝাঁ গলায় টিন বলিতে আরম্ভ করিলঃ কত যুগ যুগান্তর অতীত হ'য়ে গেছে, যখন আমার প্রথম আবিষ্কার হ'ল, আমি তাকিয়ে দেখলাম, একমাত্র লৌহ ছাড়া আর কেউ নেই কোথায়ও—

'ট্যাণ্টেলামের' বয়স খুব কম। কিন্তু যুদ্ধে সৈনিকের কোনও অঙ্গচ্ছেদের পর সেই স্থান পূরণ করিতে এর প্রয়োজন খুব বেশী হওয়ায় ইহার অহংকার কিছু বাড়িয়া গিয়াছে। বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান ভুলিয়া গিয়া ট্যাণ্টেলাম বিকৃত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলঃ আপনি কে?

টিন পিছন ফিরিয়া বলিলঃ কে দাদা, জিজ্ঞাসা করলে কথাটা? উঠে দাঁড়াও—মুখখানা একবার দেখি!

ট্যাণ্টেলাম মাথা নীচু করিয়া রহিল।

টিন বলিতে লাগিলঃ তারপর ইতিহাসের হিসাব মত লৌহ যুগের পর আসল তাম্রযুগ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে লৌহযুগ ও তাম্রযুগের মধ্যবর্তী আর একটা যুগ চ'লে গেছে সেটাকে আমরা বলতে পারি—ব্রঞ্জযুগ। তামার সঙ্গে মিশে আমিই এই ধাতুর সৃষ্টি করেছিলাম—

পিছন হইতে কে যেন আবার বিদ্রূপ করিয়া বলিলঃ আহা, কি জিনিসই করেছিলেন:

টিন ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিলঃ হাঁ, তাই করেছিলাম ব'লে আজও বিভিন্ন বিগ্রহে তখনকার দিনের কৃষ্টি ও সভ্যতার পরিচয় তোমরা পাও—

পেশী বহুল, দৃঢ়কায় ইস্পাত বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলঃ বিগ্রহ জিনিসটা কি জানি না ত! তবে আমার তৈরী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বড় রকমের খুন জখমের ব্যাপারকে লোকে যুদ্ধ-বিগ্রহ ব'লে থাকে শুনেছি—

টিন মৃদু হাস্যে উত্তর করিলঃ হাঁ, তার বেশী তোমার শুনবার কথাও নয়। এ 'বিগ্রহ' মানে যুদ্ধ নয়—এ হচ্ছে পূজার মূর্তি। কিন্তু আজ তুমি বন্দুক-কামান-বোমা ছুঁড়ে নিজেকে কিছু গর্বিত মনে করছ, কিন্তু তোমারও আগে এই 'ব্রঞ্জ' ধাতু দিয়েই লোকে কামান তৈরী করেছে—প্রত্যেক বড় বড় যুদ্ধের সময় এই ব্রঞ্জের মুদ্রার প্রচলন শাসক সম্প্রদায়কে রক্ষা করে এসেছে।

লৌহ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলঃ কিন্তু ব্রঞ্জ দিয়ে কামান! টিন উত্তর করিলঃ হাঁ, ব্রঞ্জ্ দিয়েই কামান হ'য়েছে। বিশ্বাস না হয় 'ভিক্টোরিয়া ক্রস্' গুলো তাকিয়ে দেখ। রাশিয়ানদের কাছ থেকে পাওয়া ব্রঞ্জের কামান থেকেই ঐ ভিক্টোরিয়া ক্রস্ তৈরী হয়েছে।

এমন সময় পিছন হইতে কে যেন বিকৃত কণ্ঠে আবর বিদ্রূপ করিয়া বলিলঃ জোরে জোরে। শুনতে পাচ্ছি না—

টিন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলঃ উপহাস আমি জন্ম থেকেই অংগের ভূষণ করেছি। প্রাচীন কালের ধাতু-বিশারদরা আমাকে সুনজরে দেখেন নি। এমন কি, তখন কেউ কেউ আমাকে ধাতুর মধ্যে শয়তান (Devil among metals:) বলতেও ছাড়েন নি। প্রাচীন কালে রূপোর খনির সঙ্গে যখন আমি উঠতাম, তখন আমাকে বাজে জিনিস (dross) মনে করে ফেলে দেওয়া হত। যে ঘণ্টা খুব মৃদু টুনটুন শব্দ করে তার সেই শব্দটাকে 'টিনি' (Tinny) বলা হয়, কিন্তু ঐ ঘণ্টারই মৃদু সংগীতের আওয়াজকে বলা হয় সিলভারি (Silvery)। এটা কতখানি অবিচার আপনারা বিচার করে দেখুন। ঘণ্টা ভালোই হোক্ আর মন্দই হোক্, তামা ও টিন মিশ্রণে সেটা তৈরী হয়, অন্তত তার মধ্যে রূপোর নাম গন্ধ যে থাকে না এটা সত্যি।

টিনের এই মন্তব্য রূপোর বড় গায়ে লাগিল। বসিয়া বসিয়াই সে বন্ধুদের কাছে বলিতে লাগিলঃ আমায় ঠেশ দিয়ে কথা বলে টিন। রংটা একটু সাদা আছে বলেই ত' এতদূর স্পর্ধা! অভ্র হাসিয়া রূপোকে সান্ত্বনা দিলঃ বাদ দাও ভাই, বাদ দাও। কথায় বলে, চাঁদেও দ, গোদেও দ।

টিন সবই শুনিতেছিল। রাগিয়া উত্তর করিলঃ রূপো দিয়ে সিকি-আধুলি-টাকা তৈরী হয় এইত রূপোর অহংকার? চিরদিনই কি তার পশার থাকবে? মধ্যযুগে ইংলণ্ডেও একদিন টিনের মুদ্রা প্রচলন ছিল—বিভিন্ন পরিব্রাজক ও ব্যবসায়ী তা' স্বীকার করে গেছেন।

পিছনে গোলযোগ হইতেছিল। একজন জিজ্ঞাসা

কাঁসা : মধ্যযুগের খবর টেনে এনে বক্তৃতা দিচ্ছেন উনি কে হে ?

লোহা তাহাকে বলিল : যাকে উল্টালে হন—'ন টি।'

উল্টাইয়া দিবার কথায় টিন গর্জিয়া উঠিয়া বলিল : হ্যালো ! তারপর তামার দিকে চাহিয়া বলিল : 'তামার সঙ্গে সিকিভাগে মিশে আমি কাঁসার সৃষ্টি ক'রেছি। এই কাঁসার ঘণ্টা ঠাকুর ঘরেই বল, গীর্জাতেই বল আর ইস্কুলের ছুটির ঘণ্টাতেই বল—আজও লোকের প্রাণে আবেগের সঞ্চার করে থাকে।

তোমাদের ঐ ট্যানটেনে ধাতুটা আহত সৈন্যদের হাত-পা ভালো করে দিয়ে অহংকারী হ'য়ে পড়েছে বড় ; কিন্তু তাকে মনে রাখতে হবে,—যুদ্ধের কাজে সবচেয়ে বড় প্রয়োজনই আমাকে দিয়ে সাধিত হ'য়েছে। যুদ্ধে খাদ্যাদি নিয়ে যাওয়ার হাল্কা পাত্র আবিষ্কারের জন্য নেপোলিয়ন যখন বারো হাজার ফ্রাঙ্ক পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন, তখন থেকেই আমাকে দিয়ে কিছু করা যায় কিনা এ চিন্তা বিজ্ঞানীদের মাথায় এসেছিল এবং তারফলেই ১৮২৫ খৃস্টাব্দে থমাস সাহেব টিনের কৌটার প্রচলন করেন।

কেবল তাই নয়, অন্যান্য ধাতুকে রক্ষা করবার জন্য আমার সাহায্য এরও বহু পূর্ব থেকেই নেওয়া হয়েছে।

সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ কলম তুলিয়া বসিয়াছিল। টিন তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিল : ইউরেনিয়াম—থেকে হয় এ্যাটম বোমা তৈরী। এই বোমার ভয়েই আজ ইউরেনিয়ামকে করা হ'য়েছে সভাপতি। সোনার দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় তিনিও এই সভার আজ প্রধান অতিথি ! আমার কথা আপনাদের কাছে তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু মনে রাখবেন—সংবাদপত্র, বই এবং যা কিছু ছাপা হয়, তার অক্ষরগুলিকে ঝকঝকে করে রাখি আমিই। মোটর গাড়ী বল, রেডিও বল আর এরোপ্লেনই বল, তাদের সুদৃশ্য করি আমিই। পৃথিবীর মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠ আসন হচ্ছে এশিয়ায়। সমগ্র জগতের আঠার ভাগের তের ভাগ টিনই পাওয়া যায় এশিয়ায়।

সভাপতি অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, ঘণ্টা বাজাইয়া তিনি বলিলেন—আর এক মিনিট। এর মধ্যে আপনি নিজে কি করেছেন তাই বলুন।

টিন এই প্রশ্নে বিভ্রান্ত হইয়া উত্তর করিল—বাক্স, কৌটা, গাড়ী, বাড়ী সকল কিছুতে মাত্র আমার একটি পোঁচ লাগাতেই প্রতি বৎসর পঞ্চাশ হাজার টন টিন প্রয়োজন হয়ে থাকে—

সভাপতি আবার বলিলেন, কিন্তু আপনি একা কি করেছেন বলুন।

টিনকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সোনা বিস্মিত হইয়া রূপোকে জিজ্ঞাসা করিল : টিনের ঘর, টিনের বাক্স, টিনের কৌটা এগুলোতো টিন করেছে ? তবে বলছে না কেন ?

রূপো হাসিয়া বলিল : কেবল নামেই। আসলে ত ওগুলি লোহার পাত। সকলে উপহাস করিয়া বলিল : বসিয়ে দাও কেবল বচন সর্বস্ব, আসলে ফাঁকি !

টিন কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

খুদে বৈজ্ঞানিক/দিলীপ দাস

কেঁচো

বিনয়কুমার ভট্টাচার্য

অতি সরল, নিরীহ এই প্রাণীটি আমাদের কাছে মোটেই অপরিচিত নয়। মাছ ধরার টোপ হিসাবে এর ব্যবহার প্রায় সার্বজনীন। বিশিষ্ট প্রকৃতি-বিজ্ঞানী চার্লস্ ডারউইন এদের আচরণ ও নিবাস দেখে কেঁচোকে 'চাষীর বন্ধু' ও 'স্বাভাবিক কর্ষক' বা 'Natural tiller' বলে অভিহিত করেছেন। কথিত আছে, মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা কেঁচোকে পবিত্র প্রাণীদের অন্যতম বলে গণ্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সম্প্রতি কৃষিবিজ্ঞানীদের কাছে কেঁচো নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে।

গর্তে বাস করার (burrowing) স্বভাবের দরুন কেঁচো জমাট মাটিকে সছিদ্র ও আলগা করে জল ও বাতাসের চলাচল সহজ করে দেয়। ঘাসপাতাযুক্ত মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে এরা অবিরাম খেয়েই চলে ও কুণ্ডলীকৃত বিষ্ঠার মাধ্যমে প্রচুর জৈবসারযুক্ত মাটির যোগান দেয় ও জমির উর্বরতা বাড়ায়। বিজ্ঞানী হেনরি হপ্-এর পরীক্ষায় ঐ বিষ্ঠার মধ্যে সাধারণ মাটির তুলনায় আনুপাতিকভাবে দ্বিগুণ ম্যাগনেশিয়াম, পাঁচগুণ নাইট্রোজেন, সাতগুণ ফসফরাস আর এগারোগুণ পটাশিয়াম ছাড়াও অন্তত পাঁচ-ছয় গুণ বেশী ব্যাকটেরিয়া ও Actinomycetes-জাতীয় আণুবীক্ষণিক ছত্রাকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এই বিষ্ঠা উপযুক্ত পরিমাণে থাকলে তা' মাটির ক্ষারত্ব বা অম্লত্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যে অবস্থাটা (neutral PH) উদ্ভিদের বৃদ্ধির খুবই অনুকূল। মোট কথা, কেঁচোর অনুপ্রবেশ মাটির স্বাভাবিক উৎকর্ষতাকে বাড়িয়ে তোলে। সোভিয়েত গবেষক রাজেভস্কির হিসাবে, গাছ পিছু গড়ে পাঁচ থেকে সাতশো কেঁচোর অবস্থানে ওক্ গাছের মূল বিস্তার খুবই জটিল ও দৃঢ় হয় ও এদের প্রাথমিক সজীবতা (initial viability) ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। সেদিক দিয়ে দেখলে, বনসৃজনেও কেঁচোর প্রয়োজনীয় ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

কেঁচোর খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক ক্ষমতা বিস্ময়কর। ক্যালিফোর্নিয়ার এক নমুনা সমীক্ষায় প্রকাশ, প্রায় ৮০০০ কেজির এক জৈবিক আবর্জনাস্তূপের প্রায় ৮০ শতাংশই মাত্র হাজার কয়েক কেঁচো মাস দুয়েকের মধ্যেই খেয়ে শেষ করতে পারে ও তাদের মূল্যবান বিষ্ঠার ওজন প্রায় এক কুইন্টাল। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা, কানাডা ও জাপানে প্রচুর ছোট-বড় কেঁচো-খামার চলছে যারা কেঁচোর চাষ (Earthworm-farming) ও বিষ্ঠাসারের ব্যবসা করে। প্রতিষ্ঠান ছাড়া অনেক পরিবারও এ ব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছে। প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে। মোটামুটি আলো-বাতাস পায় এরকম একটুকরো জমি যাতে থাকবে কেঁচোর আহার্য জৈবিক আবর্জনার রাশি। উপযুক্ত সংখ্যায় ভালো জাতের কেঁচো আর নিয়মিত এদের বিষ্ঠাকুণ্ডলী অপসারণ করার মত পরিশ্রম হলেই চলবে।

আমাদের গ্রামাঞ্চলে এরকম পতিত জমির অভাব নেই যেখানে গ্রামবাসীরা তাদের দৈনন্দিন অব্যবহৃত জৈবিক অবশিষ্টাংশ যেমন তরকারির খোসা ইত্যাদি, ঘাস-পাতা, কাগজ সবকিছুই জমা করতে পারেন। স্থানীয় লাল কেঁচো (Zumbricus) এ ব্যাপারে খুবই উপযোগী। তাছাড়া সাধারণ কেঁচো (Pheretima) হলেও চলবে। অবশ্য তেমন প্রয়োজন হলে আমেরিকার সবচেয়ে ভাল জাতের সার-কেঁচোও (Helodrilus) আমদানী করা যেতে পারে। নিয়মিত বিষ্ঠাকুণ্ডলী সংগ্রহ করাটা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। অগ্নিমূল্য রাসায়নিক সারের অন্তত কিছুটা বিকল্প এভাবে হতে পারে কিনা ভেবে দেখার সময় এসেছে বলে মনে হয়।

খাদ্য হিসাবে কেঁচো মাছ, হাঁস-মুরগী, শুয়োর ইত্যাদি প্রাণীর খুবই প্রিয় ও উপকারী। শুকনো কেঁচোর দেহের প্রায় ৭০ শতাংশই প্রোটিন, যার এ্যামিনো এসিড উপাদান গুলোর মধ্যে Arginine এবং Tryptophan অন্য অনেক প্রাণীজ প্রোটিনের তুলনায় বহুগুণ বেশী। কেঁচোকে মানুষের খাদ্য হিসাবে কল্পনা করতে এখনও আমাদের কিছুটা খুঁতখুঁতে ভাব থাকলেও বর্তমানে উত্তর আমেরিকা ও কানাডার কিছু কিছু হোটেলে কেঁচো-সমৃদ্ধ খাবারেরই আধিক্য দেখা যায়। কে জানে, ব্যাঙের ঠ্যাং ও আরশোলার চচ্চড়ির মত এ-জাতীয় খাবারও হয়ত একদিন জনপ্রিয় হবে।

কৃষিকার্যে কেঁচোর মত সামান্য প্রাণীর অবদান বিষয়ে আরো গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের গুরুত্ব রয়েছে। কেঁচোর দেহের শারীরবৃত্তে (Physiology) অপ্রয়োজনীয় জৈব সামগ্রীকে উন্নত ধরনের সারে পরিণত করার এক অপূর্ব স্বাভাবিক ক্ষমতা বর্তমান। এর সাহায্যে এরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক জীবন-শৃঙ্খলে (life-chain) একটা ছোট অথচ উল্লেখযোগ্য যোগসূত্রের কাজ নীরবে করে চলেছে। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে গাছের পুষ্টি, ফলে আমাদেরও অধিক আহার্য। সব দিক বিবেচনা করলে, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে অনেক সাপেরই, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় তথ্যের, সন্ধান মিলতে পারে। নয় কি?

পড়াশোনা

আলোকের প্রতিসরণ

(দ্বিতীয় পর্যায়)

ডঃ অলক চক্রবর্তী

গত সংখ্যায় আমরা সমতল তলে প্রতিসরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এবার আমরা প্রিজম্-এর ভিতর দিয়ে আলোকের প্রতিসরণ সম্বন্ধে আলোচনা করব। একটি আলোক স্বচ্ছ বস্তুকে যদি দুটি আয়তক্ষেত্রিক তল দিয়ে এমনভাবে সীমাবদ্ধ করা হয় যে, যে কোন দুজোড়া বিপরীত তল সমান্তরাল, কিন্তু অপর দুটি তল সমান্তরাল না হয়ে পরস্পর আনত অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে প্রিজম্ বলে [1 নং চিত্র]।

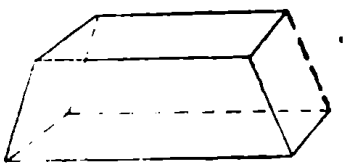

চিত্র - ১

প্রিজম্ সম্বন্ধে পড়াশোনা করার জন্য আমরা খাতায় বা কাগজে এর ছেদ (Section) এঁকে থাকি। ত্রিভুজাকৃতি প্রিজম্-এর জন্য আমরা কাগজে একটা ত্রিভুজ আঁকব। কোন একটি তল যদি ছোট হতে হতে একটি সরল রেখায় পরিণত হয় তাহলে তাকে ত্রিভুজাকৃতি প্রিজম্ বলব [চিত্র নং 2]।

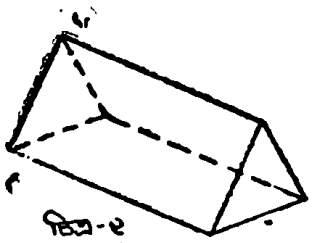

চিত্র - ২

প্রিজমটি কাঁচ দিয়ে তৈরি হলে প্রতিসরণের সূত্রানুযায়ী এর মধ্য দিয়ে আলোকের প্রতিসরণ হবে। প্রিজম্-এর মধ্য দিয়ে আলোকের দুবার প্রতিসরণ হবে। প্রথমে বায়ু মাধ্যম থেকে কাঁচ এবং পরে কাঁচ মাধ্যম থেকে বায়ুতে আলোকের প্রতিসরণ হবে [চিত্র নং 3]।

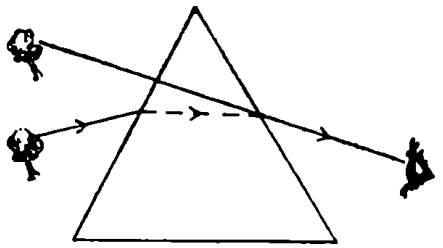

চিত্র - ৩

এবার 4 নং চিত্রটা ভাল করে দেখা যাক। ABC হচ্ছে প্রিজম্-এর ছেদ। AB তলের উপর আলো আপতিত হচ্ছে। এবং দুবার প্রতিসরণের পর AC তল

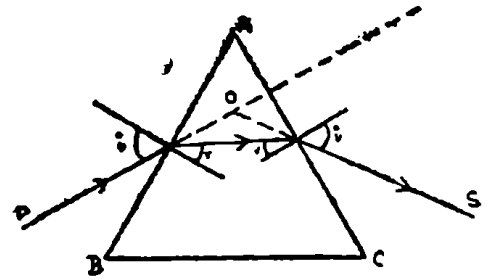

চিত্র -৪

দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। AB হচ্ছে আপতন পৃষ্ঠ এবং AC হচ্ছে প্রতিসারক পৃষ্ঠ। এদের মধ্যেকার কোণ $\angle BAC$-কে প্রিজম্-এর কোণ বলে। PQ আলোক রশ্মি AB পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে প্রতিসরণের জন্য QR পথে যাবে। এক্ষেত্রে প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের কাছে চলে আসবে। কারণ লঘুতর মাধ্যম থেকে ঘনতর মাধ্যমে আলোকের প্রতিসরণ হচ্ছে। এবার QR রশ্মি কাঁচ থেকে বায়ুতে যাচ্ছে বলে RS পথে প্রতিসৃত হবে। লক্ষ্য কর, RS রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে গেছে।

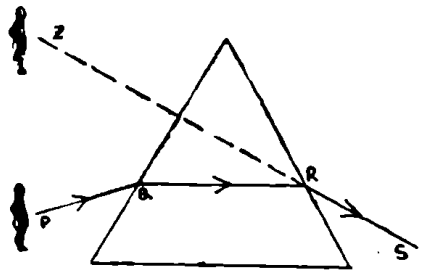

চিত্র - ৫

প্রিজম্ না থাকলে PQ রশ্মি PQOL পথে যেত কিন্তু প্রিজম্ থাকার জন্য শেষ পর্যন্ত ORS পথ গ্রহণ

করেছে। <LOR-কে দিক্ বিচ্যুতি কোণ বলে বা চ্যুতি কোণ বলে। তাহলে P-তে অবস্থিত কোন বস্তুকে S-এ অবস্থিত চোখ SRZ বরাবর দেখবে। [চিত্র নং 5]।

আচ্ছা P-তে বস্তু থাকবে। Z-এ প্রতিবিম্ব চাই সমতল আয়নার সাহায্যে! আয়না কিভাবে রাখলে সেটা সম্ভব? 6নং ছবি দেখ, সহজেই বুঝতে পারবে।

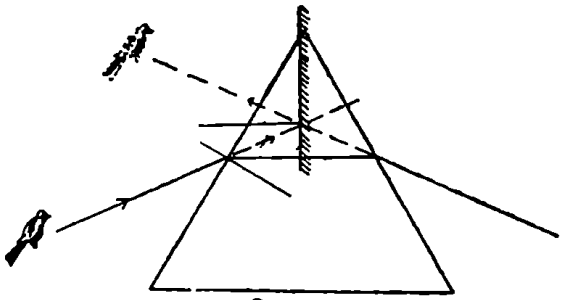

চিত্র-৬

আপতন কোণ বদলালে দিক্ বিচ্যুতি কোণ বদলে যাবে। এই পরিবর্তন কি ভাবে হয় সেটা 7নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে আপতন কোণ বাড়তে

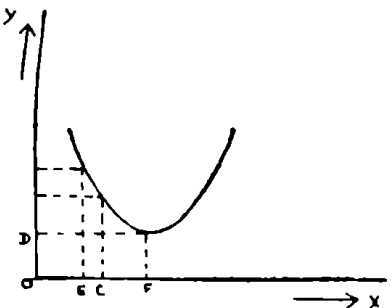

চিত্র-৭

থাকলে চ্যুতি কোণ কমতে থাকবে। আপতন কোণের একটা নির্দিষ্ট মানের জন্য চ্যুতি কোণের মান সর্বনিম্ন হয়। এরপর আপতন কোণ বাড়লে চ্যুতি কোণও বাড়বে।

সমকোণী ও সমদ্বিবাহু প্রিজম্ ব্যবহার করে পেরিস্কোপ, বায়নাকুলার ইত্যাদি তৈরী করা হয়। এই সম্বন্ধে একটু আলোচনা করি।

8নং চিত্রে PQR হচ্ছে একটি সমকোণী সমদ্বিবাহু প্রিজম্। AB আলোক রশ্মি RQ পৃষ্ঠে লম্বভাবে আপতিত হয়েছে। এখানে আপতন কোণ শূন্য। তাই প্রতিসরণ হবে না; AB আলোক রশ্মি সোজা ABC বরাবর গিয়ে PR পৃষ্ঠে C বিন্দুতে আপতিত হবে। যদি MCN,

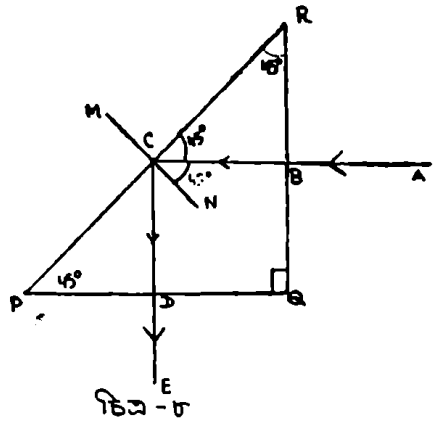

চিত্র-৮

C-বিন্দুতে অভিলম্ব হয় তাহলে কাঁচ থেকে বায়ুতে আলোক রশ্মির আপতন কোণ (<BCN) 45° হবে। বায়ু সাপেক্ষে কাঁচের সংকট কোণ হচ্ছে 42°, তাই BC আলোক রশ্মির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটবে এবং CD বরাবর প্রতিফলিত হবে। আপতন কোণ 45° বলে প্রতিফলিত কোণও (<NCD) 45° হবে। অর্থাৎ <BCD হবে 90°-র সমান। অর্থাৎ অনুভূমিক রশ্মি উল্লম্ব রশ্মিতে পরিণত হবে। আবার CD রশ্মি PQ পৃষ্ঠের উপর লম্বভাবে আপতিত হচ্ছে বলে প্রতিসৃত না হয়ে সোজা DE বরাবর বেরিয়ে যাবে। এর পরের ছবিটা দেখ।

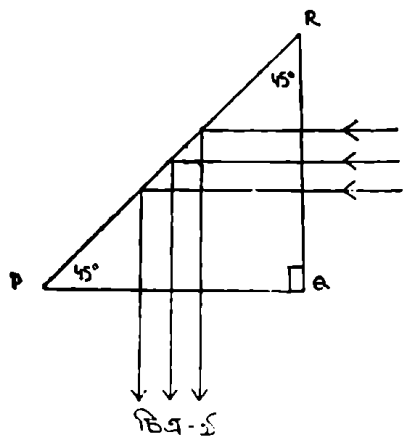

চিত্র-৯

[চিত্র নং 9]। একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক কিরণ RQ পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে PQ পৃষ্ঠ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি আলোক রশ্মি 90° করে ঘুরে গেল। দুটি প্রিজম ব্যবহার করে কি ভাবে পেরিস্কোপ তৈরী করা হয়েছে সেটি 10নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। সমতল আয়নার বদলে প্রিজম্ ব্যবহার করার সুবিধা হচ্ছে যে প্রিজম্-এ আলোকের পূর্ণ প্রতিফলন হয় কিন্তু সমতল

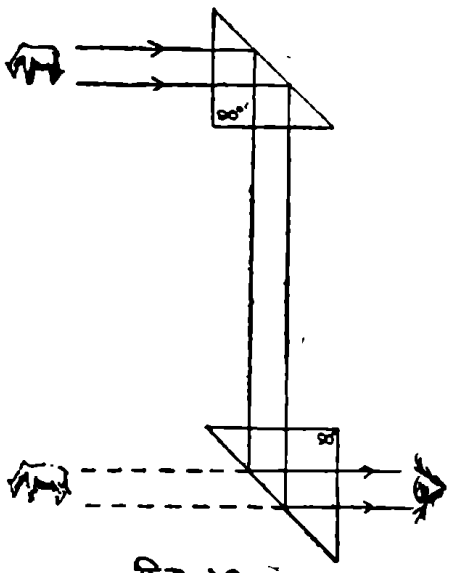

চিত্র-১০

আয়না কিছু পরিমাণ আলোক শোষণ করে।

সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সাহায্যে অবশীর্ষ প্রতিবিম্ব কি ভাবে করা হয় সেটা 11নং চিত্রে দেখানো

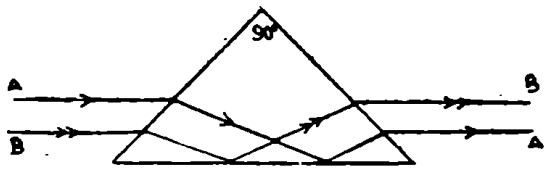

চিত্র-১১

হয়েছে এই ধরনের দুটি প্রিজম্ ব্যবহার করে কি করে প্রিজম্ বায়নাকুলার তৈরী করা হয়।

প্রিজম্ বায়নাকুলারে লেন্স্ ছাড়াও দুটি [চিত্র নং 12] সমকোণী সমদ্বিবাহু প্রিজম্ ব্যবহার করা হয়। এর ফলে বায়নাকুলারের নলের মধ্যে আলোক রশ্মি সমূহ তিনবার

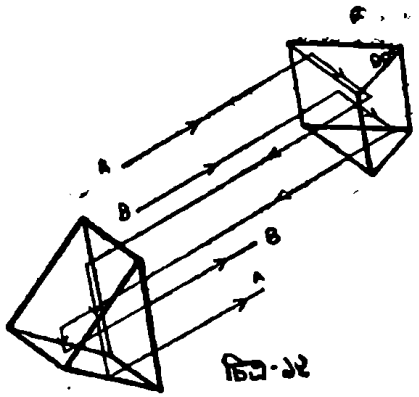

চিত্র-১২

পাক খায়। চিত্র১৮ ভাল করে দেখো, সোজা বস্তু প্রিজম্-এর ক্রিয়ার ফলে উল্টে গেছে। কিন্তু তুমি যখন বায়নাকুলার ব্যবহার করবে তখন নিশ্চয়ই সে উল্টো প্রতিবিম্ব দেখতে চাইবে না। সে ব্যবস্থা লেন্স্-এর সাহায্যে করা হয়ে থাকে।

লেন্স্ সম্বন্ধে আলোচনা পরের বার হবে।

বিজ্ঞান সংবাদ

সিমলাপাল ব্লক বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা

ব্লক যুব করণ ও বিড়লা ইনডাসট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের যৌথ উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল ব্লক ভিত্তিক একটি বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতা গত ২ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা চক্রের বিষয় ছিল মহাকাশ ও মানবজাতি। এই প্রতিযোগিতায় ১৩ জন ছাত্র অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রথম স্বপনকুমার সিংহবাবু দ্বিতীয়, অরুনকুমার সিংহমহাপাত্র তৃতীয় সুজিতকুমার পাল চতুর্থ, পার্থসারথি মণ্ডল পঞ্চম ও অমিয় পাত্র ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। পুরস্কার বিতরণ করেন লালমোহন কিসকু।

—তুষারকান্তি ষন্নিগ্রহী

পাঁশকুড়ায় বিজ্ঞান প্রদর্শনী

আন্তঃ জেলা বিজ্ঞান প্রদর্শনী মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া সায়েন্স ফোটন সেন্টারের উদ্যোগে ও পরিচালনায় পাঁশকুড়া বি. বি. হাইস্কুলে চারদিন ধরে অনুষ্ঠিত হল। বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেন শর্মা। প্রধান অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান ক্লাব সংগঠক মনি দাশগুপ্ত। প্রদর্শনীতে মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা, ২৪-পরগণা জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় ও বিজ্ঞান ক্লাবগুলি থেকে ৮২ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে ভোগপুর হাইস্কুলের ক্লাস সিক্সের ছাত্রী শাঁওলী জানার এয়ার ইণ্ডিকেটর ও পাঁশকুড়া গার্লস স্কুলের সুপর্ণা সামন্তের 'থার্মোফ্ল্যাক্স' এক কথায় সুন্দর। কাপুই হাইস্কুলের ছাত্র প্রদীপ মাইতি'র 'ধূমপানের অপকারিতা' (Effect of smoking), পাঁশকুড়া বি. বি. হাইস্কুলের ছাত্র সুকুমার মণ্ডলের 'ঝড় ও বন্যার প্রকোপ থেকে গৃহরক্ষা' ও সুকান্ত পট্টনায়েকের 'পরিবেশ দূষণ', (Pollution), বাগনানের নবতীর্থ সায়েন্স সেন্টারের ভবানী রুদ্রের 'এলার্ম ঘড়ি ও তেজস্ক্রিয়তা', গোবিন্দনগর হাইস্কুলের ক্লাস সিক্সের ছাত্র বিশ্বজিৎ হাইতের 'Wind energy' সবার ভালো লেগেছিল।

তমলুকের হ্যামিল্টন বিজ্ঞান ক্লাবের অভিজিৎ সামন্তের 'লেন্স বিহীন অনুবীক্ষণ' ও 'News speaker', সৌমেন্দ্র-বাইচারের 'ফ্ল্যাড সিগ্‌ন্যাল', বাগনান ব্লু-স্টার বিজ্ঞান ক্লাবের অমিতাভ বেরার 'মস্‌কিউটার রেফিলেড' এবং চংরাচক হাইস্কুলের ছাত্র অশেষ ভৌমিকের 'Otion Thermal Energy Conversion' বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনী চলেছিল চারদিন।

—দেবাশীষ রায়

ধারাবাহিক উপন্যাস

আগে যা ঘটেছে

[মফস্বল শহরে একটি ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়ে এসেছে সুশান্ত। ব্যাঙ্কের নাম অল ইণ্ডিয়া কমন পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড। সংক্ষেপে এ. আই. সি. পি. লিঃ। একেবারে ম্যানেজারের চাকরি। ছোট শহর। শহরের বুকের ওপরেই ছোট নদী। পরিবেশটা খুবই ভাল লেগেছে সুশান্তর। এই শহরে এসে প্রথমেই যার সঙ্গে আলাপ হয় —সুশান্তর, তার নাম সরযূপ্রসাদ। অবাঙালী হলেও ভাল বাংলা জানে। অত্যন্ত মিশুকে। সরযূপ্রসাদকে প্রথম দিনই ভালো লেগে যায়—সুশান্তর। কিন্তুহ ঠাৎই ব্যাঙ্কে হয়ে গেল ডাকাতি। এবং অত্যন্ত আশ্চর্যভাবে। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে, ব্যাঙ্কের তালা না ভেঙে স্ট্রংরুম থেকে ডাকাতি হয়ে গেল বহু টাকা। এটা কি করে সম্ভব? স্ট্রংরুমের তালা খুলতে হলে তো দুটো চাবির প্রয়োজন হয়—যার একটা থাকে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে, আর একটা সুশান্তর নিজের কাছে। তা হ'লে ডাকাতেরা তালা খুলল কি করে? ব্যাঙ্কে গিয়ে সুশান্ত অবাক হয়ে গেল কাণ্ডকারখানা দেখে। একটু পরেই এল পুলিশ। সকলের জবানবন্দী নেওয়া হল। দেখতে দেখতে গোটা শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও একজন ডিরেক্টর এলেন। ব্যাঙ্কের সব কর্মচারীই দোষ চাপাল সুশান্তর উপরে। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, লকারের দুটো চাবির একটাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সুশান্ত ভীষণ ভেঙে পড়ল। অবশেষে তার বাবার বন্ধু সতীনাথ বাবুকে কলকাতায় চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাল। সতীনাথ বাবু—ডিটেক্‌টিভই শুধু নন, বড় বৈজ্ঞানিক। তিনি এলেন, কয়েকদিন থেকে, চলেও গেলেন। ব্যাঙ্ক সুশান্তকে সাসপেণ্ড করল। রহস্য, রহস্যই রয়ে গেল।]

কর্মহীন অবসর দিনগুলি সুশান্ত ভাবতে পারছিল না। কাজ না থাকলে মনের মধ্যে নানা দুশ্চিন্তা বাসা বাঁধে এক্ষেত্রেও তাই শুরু হ'ল। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অবশ্য তাকে সাসপেণ্ড করলেও খাওয়া পরা চালাবার মত অল্প কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করেছিলেন। সুশান্ত খবর পেল, ক্যাশিয়ার বৈজুনাথ বাবুর অবস্থাও ঠিক তারই মত। আরও খবর পেল ব্যাঙ্ক আর পুলিশ একজোটে রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য চেষ্টা করছে আর এ ব্যাপারে দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা সব জায়গায় সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্য প্রার্থনা করেছে। তাঁরাও নাকি সাড়া দিয়ে কাজে নেমে পড়েছেন।

তার মানে—এবার থেকে আরও কিছু অস্বস্তিকর পরিস্থিতির জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

কিন্তু কাজ তেমন এগোল না, এবং দেখতে দেখতে প্রায় তিন মাস কেটে গেল। শহরের সেই উত্তেজনাও স্বাভাবিক ভাবেই কমে এল। এখন আর ও নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। ভাবটা, যা হবার হবে। যে সব লোকের ব্যাঙ্কে টাকা জমা ছিল তারাও অনেকটা নিরুদ্বেগ হতে লাগল, কারণ ব্যাঙ্ক আবার যথারীতি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সুশান্ত সময় কাটাতে না পেরে আবার ক্লাবে যেতে শুরু করল। প্রথম প্রথম ক্লাবের সদস্যরা তার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করত। সুশান্তর ধারণা ওরা তার সম্বন্ধেই আলোচনা করছে নিশ্চয়ই। কিন্তু দু'দিনেই সে ভাব কেটে গেল। হারানো বন্ধুরা আবার তাকে ডেকে কথা বলতে শুরু করল।

মাস খানেক বাদে খবর এল এবার ব্যাঙ্কে নতুন একজন ম্যানেজার এসেছেন। খুব নাকি আদব-কায়দা দুরস্ত লোক। দু'দিনেই ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা তাঁর চালচলনে মুগ্ধ হয়ে গেছে। এর আগে কখনও কোন ব্যাঙ্কে কাজ করেছেন কিনা জানা নেই, তবে ব্যাঙ্কের উপর মহলে তাঁর নাকি বেশ খাতির আছে। আর হয়তো সেজন্যই এখানে শিক্ষানবিশী করারও দরকার হয়নি তাঁর।

সুশান্ত খবরটা শুনল আর এও শুনল যে ভদ্রলোক দু' একদিনের মধ্যেই তাদের ক্লাবে যোগ দেবেন।

যথাসময়ে আলাপ হ'ল, বেশ ছিমছাম দোহারা চেহারা পোশাকপরিচ্ছদে বেশ পরিপাটি—খাঁটি বিলেতী পোশাক যাকে বলে। এমনকি টাই বাঁধার ধরনটাও দিশী সাহেবের মত নয়। মুখের রংটাও বেশ টকটকে। এদেশীদের মধ্যে অত লালচে মুখ বড় একটা চোখে পড়ে না। তবে মুখটাই ঐ রকম; গায়ের অর্থাৎ হাত পা ফর্সা

হলেও এতটা টকটকে নয়। দোষের মধ্যে কথায় কথায় গলাটা একটু ঝেড়ে নেবার অভ্যাস। হয়তো মুদ্রাদোষ, কিংবা গলায় কোন অসুখের দরুনও হতে পারে। আর গলা ঝাড়লে গলার স্বরটা একটু যেন কেমন লাগে, আগের মত মনে হয় না।

'আরে, আপনি?...

তা হোক, এরকম কত লোকই তো আছে দুনিয়ায়। সুশান্তর মনে পড়ল, সে যখন কলেজে পড়ত তখন তাদের একজন অধ্যাপক এই ভাবে দুই স্বরে কথা বলতেন। যখন ক্লাসে লেকচার দিতেন তখন গলার স্বর হত খুব চাঁছাছোলা —যেন কেউ করাত দিয়ে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে কাঠ চিরছে। কিন্তু ক্লাসের বাইরে যখন করিডোরে বা কলেজের লনে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতেন তখন মনে হত এ কার গলা শুনছি। তিনিও যতদূর মনে পড়ে, কথা বলার সময় গলাটা মাঝে মাঝে ঝেড়ে নিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বরটা কেমন বদলে যেত। এ ভদ্রলোকেরও মনে হচ্ছে সেই রকমেরই অভ্যাস।

কিন্তু যাই বল, লোকটি বেশ হাসিখুশি, ক্লাবের সকলের সঙ্গে যেচে যেচে নিজেই আলাপ করে নিলেন। সুশান্তর কাছে এসে পরিষ্কার ইংরাজীতে বললেন, "আপনি—?

সুশান্ত একটু থতমত মুখে বলল, "আমার নাম সুশান্ত চ্যাটার্জী।"

"সুশান্তো চ্যাটার্জী—সু-শান্তো—সু-শান্তো নামটা যেন শোনা শোনা লাগছে; ও, আই সি,। মিস্টার চ্যাটার্জী, আপনিই তো এখানে আগে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন? আপনার কথা আমি সব শুনেছি। ভালো মানুষ হবার অনেক বিপদ বুঝলেন মিস্টার চ্যাটার্জী।—অনেক বিপদ। তবে আমি যতটা পারি আপনাকে সাহায্য করব। আপনি আমাকে নির্ভয়ে বিশ্বাস করতে পারেন। "উই আর ফ্রেণ্ডস্ —কেমন না?'—বলে নতুন ম্যানেজার সুশান্তর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

সুশান্ত, একটু অবাক হলেও, সেও একটু অপ্রতিভ ভাবে হাতটা বাড়িয়ে করমর্দন করল। সে শুনেছিল এ লোকটি পাক্কা সাহেব, কাজেই সৌজন্য প্রকাশের জন্য হ্যাণ্ড শেক্ করাটাই এর পক্ষে স্বাভাবিক।

নতুন ম্যানেজারের নাম মিস্টার ত্রিবেদী। পুরো নাম জানা নেই, জিজ্ঞাসা করলে বলেন, কে. সি. ত্রিবেদী। কে. সি. বলতে অনেক কিছুই হতে পারে। কৃষ্ণচন্দ্রও হতে পারে আবার কিষেণচাঁদও হতে পারে, কমলাচরণও হতে পারে আবার কমলাচর্ণও হতে পারে। অর্থাৎ নাম শুনে বুঝবার উপায় নেই লোকটি কোন অঞ্চলের। ত্রিবেদীকে এখানে বেশির ভাগ লোকই তেওয়ারী বলে, যেমন দ্বিবেদীকে বলে দুবে, চতুর্বেদীকে চৌবে। কিন্তু ত্রিবেদী, চতুর্বেদী বলে পরিচিত লোকেরও অভাব নেই, সারা উত্তর ভারতে—বিহার, উত্তর প্রদেশে, এমন কি বাংলায়ও। বাঙ্গালীদের মধ্যেও বহু ত্রিবেদী সুশান্ত নিজেই দেখেছে,—তবে তাঁরা নিজেদের ত্রিবেদীই বলেন তেওয়ারী বলেন না কেউ। এ লোকটি সাহেবী কায়দায় সর্বদা পদবীর সঙ্গে নামের আদ্যাক্ষরটুকু ব্যবহার করায় ইনি যে কোন্ রাজ্যের লোক তা বোঝা কঠিন। কথাবার্তায় চোস্ত ইংরিজিটাই বেশি বলেন, কিন্তু হিন্দী বা উর্দু মিশ্রিত হিন্দী বলতেও আটকায় না এঁর। আবার বাঙ্গালীদের সঙ্গে আলাপ করবার সময় দরকার হলে চমৎকার বাংলায়ও কথা বলেন। অবাঙ্গালী সুলভ কোন টান আছে কি-সে কথায়? বোধ হয় না। অন্ততঃ সুশান্ত ওঁর মুখে সামান্য যেটুকু বাংলা শুনেছে তাতে তো তাই মনে হয়েছে। অবশ্য যারা ইংরেজি জানে তাঁদের সঙ্গে মিস্টার ত্রিবেদী ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলা বড় একটা পছন্দ করেন না। ছেলেবেলা থেকেই সাহেবী স্কুলে ইংরিজি

মিডিয়ামে পড়ে এই বিশ্রী (?) অভ্যাসটা হয়ে গেছে অবশ্য বিশ্রী অভ্যাস স্বীকার করলেও তা সংশোধনের কোন আগ্রহ তাঁর মধ্যে দেখা যায় না।

তা সুশান্তর তাতে কিছু আসে যায় না। সেও ইংরিজি মিডিয়ামে পড়া ছাত্র। চোস্ত ইংরিজি বলতে তারও আটকাবার কথা নয়। তবে কিনা—স্বাধীন দেশে স্বদেশী লোকের সঙ্গে একটা বিদেশী ভাষায় কথা বলতে চক্ষুলজ্জায় তার একটু বাধো-বাধো ঠেকে।

সাত

সুশান্তকে মাঝে মাঝে ব্যাঙ্কেও যেতে হয়। ঐ একটাই তো ব্যাঙ্ক এই শহরে—এ. আই. সি. পি. ব্যাঙ্ক লিমিটেড। সেখানেই সে ম্যানেজার হয়ে এসেছিল কিন্তু কী কাণ্ডই না হয়ে গেল! সুশান্তকে কর্তারা সাস্‌পেণ্ড করলেন। সাস্‌পেণ্ড করলেও তার খাওয়া-পরা চালাবার জন্য ব্যাঙ্ক যে টাকাটা মাসে মাসে মঞ্জুর করেছে সেটা তো তাকেই গিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কাজেই মাসে একটা দিন অন্ততঃ সেখানে যাওয়া দরকার। এখানে পুলিশের নজর-বন্দী হয়ে আরও কতদিন থাকতে হবে কে জানে? তবে নতুন ম্যানেজার আসায় এবং তাঁর সঙ্গে ভাব হবার ফলে সুশান্তর মস্ত একটা সুবিধা হয়ে গেছে। এখন আর তাকে একটা-তারই-অধীনস্থ কর্মচারীদের চোখের কৃপাদৃষ্টি সইতে হয় না। সোজা সে ম্যানেজার সাহেবের ঘরে গিয়ে ঢোকে। মিনিট কয়েক এটা-সেটা ছেঁদো কথা আদানপ্রদানের পর ম্যানেজার সাহেবই চেকটা তুলে দেন তার হাতে। ভাঙ্গানো টাকার দরকার হলে তিনিই বেয়ারা দিয়ে সেটা ভাঙ্গিয়ে দেন। ক্যাশিয়ারের কাছেও আসতে হয় না তাকে।

ক্যাশিয়ার বৈজুনাথ বাবুর অবস্থাও কিন্তু খুব সুখের নয়। তাঁকে অবশ্য সাস্‌পেণ্ড করা হয়নি, আগের মতই কাজ করে চলেছেন তিনি। তবে নজরবন্দী অবস্থা থেকে রেহাই তিনিও পান নি। তাঁকেও সপ্তাহে একবার থানায় গিয়ে হাজিরা দিয়ে আসতে হচ্ছে সুশান্তর মতই। তবু যা হোক, বাইরের অনেকেই সে খবর রাখে না,—এই একটু স্বস্তি।

সেদিনও মাসের গোড়ার দিকে সুশান্তকে যেতে হয়েছিল ব্যাঙ্কে। খুব হিসেব করে চললেও, যা দিনকাল পড়েছে, টাকার যেন ডানা গজিয়েছে। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে কোথায় যে উড়ে যায়! বাড়িতে এই দুঃসংবাদটা দেব দেব করে এখনও সে দেয় নি। মাসে মাসে যে টাকাটা সে মা'র নামে মনি অর্ডার করত এখনও সে, কষ্ট হলেও, তা করে যাচ্ছে। কি হবে তাঁদের মিছেমিছি উতলা করে। ও তো আর এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারছে না। খবর পেলে তাঁরাই হয়তো ছুটে আসবেন। সে এক বিশ্রী-ব্যাপার হবে। সতীনাথ বাবু সাবধানী লোক, তিনি নিশ্চয়ই বাড়িতে এ খবরটা দেবেন না।

সুশান্ত ব্যাঙ্কে ঢুকতেই সবাই আড়চোখে তার দিকে একবার দেখে নিল খোদ বেয়ারাগুলো পর্যন্ত। সকলের মুখেই যেন কেমন একটা টিপিটিপি হাসি! সুশান্ত সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা ম্যানেজারের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ঘরের সামনেই স্প্রিং-ডোর। তার গায়ে ঝকঝকে পেতলের ফলকে ম্যানেজারের নাম লেখা। স্প্রিং-ডোরের পেছনে একটা পর্দা ঝুলছে।

সুশান্ত একবার স্প্রিং-ডোরের সামনে মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে দেখে নিল ঘরে আর কেউ আছে কিনা। না, কেউ নেই। তখন "ভেতরে আসতে পারি?"—বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে ঘরে ঢুকে পড়ল।

"আরে, আসুন আসুন মিস্টার চ্যাটার্জী! তার পর? ভালো আছেন তো? কয়েকদিন ক্লাবে দেখি নি মনে হচ্ছে!"

সুশান্ত জানাল, মোটামুটি দেখতে গেলে সে ভালোই আছে। তবে কাজকর্ম না থাকায় শরীর চালনা হচ্ছে না। তাই খিদেও তেমন হচ্ছে না। তাই সে বিকেলের দিকে একটু হাঁটা-চলা শুরু করেছে। নদীর ধার দিয়ে ফুরফুরে হাওয়ায় বেড়াতে, একা হ'লেও, নেহাৎ খারাপ লাগে না। যেদিন একটু বেশি হাঁটা হয়ে যায় সেদিন আর ক্লাবে যাওয়া হয় না। যাক্ গে, মাসে একবার ব্যাঙ্কে না এসে তো উপায় নেই, তাই আসতেই হ'ল।

"ওঃ হো, তাও তো বটে! আচ্ছা, বসুন।" বলেই ম্যানেজার সাহেব ক্রিং ক্রিং করে টেবিলের ওপর রাখা কলিং বেলটা বাজিয়ে দিলেন। বললেন ক্যাশ টাকাই নিয়ে যান, তাহলে আর ভাঙ্গাতে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে পাগড়ী-পরা চাপরাশী এসে সামনে দাঁড়াল আর সেই ফাঁকে আড়চোখে সুশান্তকেও একবার দেখে নিল। সুশান্ত আজ যেন সকলের কাছেই একটা দ্রষ্টব্য পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটু পরেই চাপরাশী টাকাটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে গেল এবং যাবার সময় আর একবার আড়চোখে সুশান্তর দিকে তাকাতে ভুলল না।

মিস্টার ত্রিবেদীর হাত থেকে এ মাসের মাসোহারাটা নিয়ে পকেটে পুরে উঠতে যাবে এমন সময় ত্রিবেদী সাহেব

বললেন, "আরে বসুন না একটু। তাড়া নেই তো! আমারও হাতে তেমন জরুরী কাজ নেই, একটু গল্প করা যাক্। বলেছি তো উই আর ফ্রেণ্ডস্। একটু চা আনতে বলি? চা না কফি?"

হঠাৎ চলে যাওয়া ব্যাপারটা ঐ একই দিনে ঘটায় হয়তো কথাটা উঠেছে। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল ওটা কাক-তালীয় ব্যাপার। অর্থাৎ তাল গাছে একটা কাক বসেছিল। কাকটা উড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তালটাও পড়ে গেল।

কি নামটা যেন ভদ্রলোকের?...

সুশান্তকে একটু ইতস্ততঃ করতে দেখে ত্রিবেদী হেসে ফেললেন।—'নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না।" তেমনি হাসতে হাসতে আবার কলিং বেল টিপলেন। পর্দা ঠেলে আবার সেই বেয়ারার আবির্ভাব ঘটল। ত্রিবেদী সাহেব বললেন, "দো পিয়ালা কফি।"

কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আবার গল্প শুরু হ'ল। মিস্টার ত্রিবেদী বললেন, "ক্লাবের মেম্বারদের মুখে তো আপনার প্রশংসা শুনতে শুনতে অবাক্ হয়ে যাচ্ছি! আপনি এমন একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন কি করে? আচ্ছা, সরযূপ্রসাদ নামে এক ভদ্রলোকের কথা শুনেছি। তিনিও নাকি ক্লাবের একজন বড় পাণ্ডা ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধেও মেম্বারদের মুখে সুখ্যাতি ছাড়া আর কিছু শুনি নি। তিনি তো আপনারও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু ঐ ঘটনার পরদিন থেকেই তিনিও নাকি কোথায় চলে গেছেন! তাঁর সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়? মানে এই ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা সম্বন্ধে বলছি।"

সুশান্ত একটু চুপ করে থেকে বলল, "সরযূপ্রসাদ লোকটির এখন, কাকটা উড়ে গেল বলে তাল পড়ল না তাল পড়ল বলে কাকটা উড়ে গেল কে বিচার করবে? এখানেও হয় তো ঐ রকম কিছু হয়ে থাকবে বলে আমার মনে হয়! বড়লোকের ছেলে, টাকাপয়সার অভাব নেই। পারিবারিক মস্ত ব্যবসা আছে, তা থেকে প্রচুর লাভ হয় এবং ও-ও তার একটা বড় ভাগ পায়। অথচ নিজেকে কিছুই করতে হয় না। ফলে স্বভাবটা দিলদরিয়া হয়ে গেছে। এখানকার লোক না হলেও বেশির ভাগ সময় এখানেই থাকে এবং একাই থাকে। হয়তো নিজের বাড়ির পরিবেশ ওর তেমন পছন্দ হয় না। এরই মধ্যে এদিক্-সেদিক্ বেড়াতে যেতেও ভালোবাসে। দূরদূরান্তরেও, এই সেদিনও তো দিনকয়েক আমেরিকায় ঘুরে আসবে বলছিল। অনেকদিন ছিল কিনা ও-দেশে। বন্ধুবান্ধব ওখানেও অনেক আছে মনে হয়। হয়তো সেখানেই গেছে, তবে আমার ধারণা, শীগ্‌গিরই ফিরে আসবে এবং—"

"এবং তখন হয়তো আপনাকে সাহায্য করবার লোক পেয়ে যাবেন একজন। তাই না?—কিন্তু যতদিন না

আসছে, আমিও আপনাকে একটু একটু সাহায্য করবার চেষ্টা করব। বিশেষ করে যখন আপনার কাজের দায়িত্বটা আমারই ঘাড়ে এসে পড়েছে।"

সুশান্ত কোন জবাব দিল না।

মিস্টার ত্রিবেদী আবার বললেন, "কি নামটা যেন ভদ্রলোকের ? হ্যাঁ, সরযূপ্রসাদ। কিরকম দেখতে বলুনতো ?"

"ফরসা, ড্যাঙ্গা, আর একটা গাল জুড়ে মস্ত বড় একটা লাল জড়ুল,—যা ও নাকি জন্মসূত্রে পেয়েছিল। ওই জড়ুলটির জন্য হাজার লোকের মধ্যে থেকেও ওকে খুঁজে বার করা খুবই সহজ। ও-রকম আর কখনও আমি দেখি নি।"

"ভারি আশ্চর্য তো ! আচ্ছা, আপনার বন্ধুর,—আপনি তো বলছেন আমেরিকায় বেড়াতে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি। বহুদিন ও-দেশ ছেড়ে এসেছেন। নিশ্চয়ই এবার ট্যুরিস্ট হিসেবে গেছেন। ওখানে থাকবার পার্মানেণ্ট ভিসা নিশ্চয়ই নেই তাঁর। এখন তো ওরা এ বিষয়ে ভীষণ কড়াকড়ি করে ! তা হলে হয়তো সত্যিই শীগ্‌গির ফিরে আসবেন। আর, এখানকার বাড়ি যখন ছেড়ে দেন নি তখন হয়তো এখানেই আবার ফিরে আসবেন। তাই না ?"

"তাই তো মনে হয়। জিনিসপত্রও, সব কিছুই প্রায় রেখে গেছে, আর যে লোকটা বাড়িতে ওর কাজকর্ম, রান্নাবান্না করে দিত সেও নাকি চলে যায় নি। তবে মনিবের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হয়তো কিছুদিন মুল্লুক ঘুরে আসতে গেছে। সে ফিরে এলেই সব জানা যাবে। দেখা যাক্—"

এই সময়ে বেয়ারা একটা স্লিপ্ নিয়ে এল। এক ভদ্রলোক ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান।

"আমিও তবে উঠি"—বলে সুশান্তও ঘর থেকে বেরিয়ে এল। [ক্রমশঃ]

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত (প্রথম পর্যায়) রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল

ষষ্ঠ শ্রেণী : তিনটি পুরস্কার ।। সপ্তম শ্রেণী : তিনটি পুরস্কার ।। অষ্টম শ্রেণী : তিনটি পুরস্কার

প্রথম

রাকা সাহা, বয়স ১২
(কোটা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়)
ডি সেন (এন. ডি.) প্রাইভেট লিঃ
কে. টি. পি. পি. সাকাতপুর
কোটা ৩২৪ ০০৮

দ্বিতীয়

পীযুষ চক্রবর্তী, বয়স ১০
(চুঁচুড়া দেশবন্ধু মেমোরিয়াল হাইস্কুল)
গ্রাম সেবক ট্রেনিং সেণ্টার
পোঃ চুঁচুড়া, আর এস, হুগলী
পিন—৭১২১০২

তৃতীয়

শান্তিময় রায়, বয়স ১১
(দক্ষিণ বারাসাত শিবদাস আচার্য হাইস্কুল)
গ্রাম+পোঃ দক্ষিন বারাসাত
জেলা—২৪ পরগনা

প্রথম

অজিত দেবনাথ,
গ্রামঃ চরমাজাদিয়া (নবদ্বীপ)
পোঃ চরব্রহ্মনগর
জেলা নদীয়া

দ্বিতীয়

তপন ঘোষ, বয়স ১১
(বি. ই. কলেজ মডেল স্কুল)
১/১, বাকসাড়া ভিলেজ রোড
হাওড়া—৭১১ ১০৯

তৃতীয়

সৌম্য চট্টোপাধ্যায়
(বালীগঞ্জ গভঃ হাইস্কুল)
সাহাপুর গভঃ হাউসিং এস্টেট
ব্লক এ, ফ্ল্যাট ২
নিউ আলিপুর, কলকাতা-৩৮

প্রথম

সোনালী মণ্ডল ১৩
(ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম ফর গার্লস)
পোঃ জোকা
এ-৯/১, সত্যেন পার্ক
মহাত্মা গান্ধী রোড
পোঃ জোকা, কলকাতা

দ্বিতীয়

সুজয় দত্ত ১৩
(টাকী গভঃ স্পনসর্ড মাঃ পাঃ স্কুল)
৩২ই, হরমোহন ঘোষ লেন
কলকাতা-১০

তৃতীয়

মৃগাঙ্কমৌলি দেব ১৩
বি. বি. ইনস্টিটিউশন (উত্তর ত্রিপুরা)
পোঃ আলগাপুর, উত্তর ত্রিপুরা
পিন-৭৯৯২৫০

বিচারক মণ্ডলী : তারকমোহন দাস, অজয় হোম, সমরজিৎ কর

ডাক যোগে মানপত্র ও সম্মানমূল্য প্রেরণ করা হবে।

সম্পাদক : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

কৃতী বিজ্ঞানীঃ অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র

বিবেক রায়

(1890—1963)

ভারতের মুষ্টিমেয় যে ক'জন বিজ্ঞানী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিজ্ঞান সাধনা করে গেছেন, গবেষণা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, মাতৃভূমিতে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার প্রসারের জন্যে বিভিন্ন সংস্থা স্থাপন করেছেন এবং কৃতী বিজ্ঞানী ছাত্রগোষ্ঠী রেখে গেছেন, অধ্যাপক শিশির কুমার মিত্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ভারতে বেতার-বিজ্ঞান সাধনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

ডাঃ-শিশিরকুমার মিত্র

1890 খ্রীস্টাব্দের 24শে অক্টোবর তারিখে কলকাতায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শিশির কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জয়কৃষ্ণ মিত্র, মাতার নাম শরৎ-কুমারী দেবী। শরৎকুমারী ছিলেন চিকিৎসক। ভাগল-পুরের লেডি ডাফরিন হাসপাতালে তিনি কার্যভার গ্রহণ করায় জয়কৃষ্ণ সপরিবারে ভাগলপুরে চলে যান এবং সেইখানেই বাড়ী তৈরি করে বসবাস করতে থাকেন।

ভাগলপুর থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ ক'রে শিশির কুমার সেখানকার টি. এন. জে. কলেজে এফ. এ. ক্লাশে ভর্তি হন। এফ. এ. পাশ ক'রে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন সেখানকার প্রেসিডেন্সী কলেজে। ঐ কলেজ থেকেই তিনি বি. এস-সি. এবং এম. এস-সি. পাশ করেন। 1912 সালে পদার্থ বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে শিশিরকুমার অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হন।

আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন এম. এস-সি. পাশ করার পরই শিশির কুমারকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। প্রথমে তিনি ভাগলপুরের টি. এন. জে. কলেজে ও পরে বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বেশীদিন শিশির কুমারকে কলকাতার বাইরে থাকতে হয় নি। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ণধার। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর বিভাগ গঠনের উদ্দেশ্যে দেশের করেকজন কৃতী পদার্থ-বিজ্ঞানীকে আমন্ত্রণ জানান স্যার আশুতোষ। আমন্ত্রিত সেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে শিশির কুমার ছিলেন অন্যতম।

1916 সালে শিশির কুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে স্নাতকোত্তর পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনার কাজে ব্রতী হন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করেন গবেষণাও। তখন ঐ কলেজে পদার্থবিদ্যার তারকনাথ পালিত অধ্যাপক ছিলেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন। অধ্যাপক রামনের অধীনে Interference and diffraction of light সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে শিশির কুমার 1919 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর যান বিদেশে। প্যারিসে সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ফ্যাব্রির অধীনে আলোক তরঙ্গ বিষয়ে গবেষণা ক'রে শিশিরকুমার সেখান-কার ডি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। কয়েক মাস মাদাম কুরীর অধীনে কাজ করবার সৌভাগ্যও হয় তাঁর। ইলেকট্রন টিউব বা রেডিও ভাল্‌ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে শিশিরকুমার এরপর চলে যান ন্যানসি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিট্যুট অফ ফিজিক্সে। সেখানে অধ্যাপক গুডনের কাছে কিছুকাল গবেষণা ক'রে তিনি বেতার-বিজ্ঞানের সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা উপলব্ধি করেন।

1923 খ্রীস্টাব্দে দেশে ফিরে এসে ডক্টর মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। স্যার আশুতোষের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে বেতার-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণায় লিপ্ত হন। বিজ্ঞান কলেজে 2CZ নামে এক

বেতার প্রেরক যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বেতার কেন্দ্র থেকে তখনকার দিনে নিয়মিত ভাবে বক্তৃতা ও গান-বাজনার অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই বেতার বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার প্রবর্তন করেন অধ্যাপক শিশির কুমার মিত্র।

শিশির কুমার ঊর্ধ্ব আকাশের আবহমণ্ডল, বিশেষ ক'রে আয়নমণ্ডল সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে। আয়নমণ্ডলে বেতার তরঙ্গের শোষণ সম্পর্কে তাঁর পরিচালনায় যে সব গবেষণা হয়, বিজ্ঞান জগতে তা যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। তিনি সর্বপ্রথম তাঁর নিজের ল্যাবরেটরীতে তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে দেখান—কি ভাবে বেতার তরঙ্গ ঊর্ধ্বাকাশের আয়নযুক্ত স্তর বা আয়নোস্ফিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।

আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে দীর্ঘকালব্যাপী মৌলিক গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ শিশিরকুমার 1958 সালে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন।

1932-33 সালে আন্তর্জাতিক মেরু বছরের কাজ শুরু হয়। সেই সময় আয়নমণ্ডল ও পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্বন্ধে সারা পৃথিবীব্যাপী গবেষণার কাজ চালানো হয়। ইউরোপের অনেক দেশ এতে অংশ গ্রহণ করে। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে কেবল ভারতবর্ষই এই গবেষণায় অংশ গ্রহণ করে অধ্যাপক মিত্র ও তাঁর শিষ্যবর্গের সক্রিয় প্রতিনিধিত্বে।

1949 সালে আমেরিকায় আন্তর্জাতিক আয়নোস্ফিয়ার কনফারেন্সে শিশিরকুমার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

1962 সালে অধ্যাপক মিত্রকে জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ দিয়ে সম্মানিত করেন। এ ভিন্ন সারা জীবনে অধ্যাপক মিত্র অনেক পুরস্কার লাভ করেন। তার মধ্যে রাজা পঞ্চম জর্জ সিলভার জুবিলী মেডেল, এশিয়াটিক সোসাইটির সায়েন্স কংগ্রেস মেডেল ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মেডেল অন্যতম।

অধ্যাপক মিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হলো তাঁর দূরদৃষ্টি, কর্তব্যনিষ্ঠা, সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি ও নিয়মানুবর্তিতা। চলাফেরা, কথাবার্তা, বেশভূষা ও আচার ব্যবহারেও ছিল তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্য।

1963 সালের 13ই আগস্ট তারিখে বাংলা তথা ভারতের এই কৃতী বিজ্ঞানীর কর্মবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

উচ্চমাধ্যমিকের সেরা বই

উচ্চমাধ্যমিক রসায়ন
—ডঃ রণজিৎ দাস

উচ্চমাধ্যমিক ব্যবহারিক রসায়ন
—ডঃ রণজিৎ দাস

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা
—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল,
ডঃ অসীম চট্টোপাধ্যায়,
ডঃ সুরদীশ দত্ত

উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান
—ডঃ প্রতীপ চৌধুরী,
ডঃ নিতাই মুখোপাধ্যায়

Higher Secondary English Grammar & Composition
—Deb Kumar Chatterje

ভাষাচর্চা ও সাহিত্যকথা
—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র ও
ডঃ নির্মল দাশ

দর্শনশাস্ত্রের ভূমিকা
—ডঃ বিশ্বনাথ সেন

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ
—ডঃ শ্যামল সেনগুপ্ত

English Medium

An Introduction to H.S. Biology
—Sanyal, Chatterjee, Dutta

An Introduction to H.S. Chemistry
—Dr. R. Das

H. S. Business Organisation
—Prof B. K. Biswas

ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানি ● ৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ (৩৫-৪৫৩৪)

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

বিগত ৫ই জুন কোলকাতায় দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে। এই উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করেন দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল এবং এটিকে বাস্তবমুখী করবার জন্য সক্রিয় সহযোগিতা করেন ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ কেমিক্যাল বায়োলজি এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কমিটি।

এই অনুষ্ঠানটি যাদবপুরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ কেমিক্যাল বায়োলজি হলে পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীভবানী মুখার্জী। শ্রীমুখার্জি তাঁর ভাষণে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গলের কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করেন এবং তিনি সমাজে প্রতিটি মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হবার জন্য আহ্বান করেন। তিনি বিভিন্ন শিল্প সংস্থা যারা আমাদের পরিবেশ নষ্ট করবার চেষ্টা করছেন, তাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত পরিবেশ সংক্রান্ত আইন রয়েছে, এই আইন কঠোর ভাবে পালন করবার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মণাল্র মোহন চক্রবর্তী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ মুক্ত করবার ব্যাপারে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এবং বিভিন্ন সমাজমুখী সংস্থার সাথে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ মুক্ত করবার ব্যাপারে এগিয়ে আসতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করতে আগ্রহী। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গলের এই প্রচারমুখী অভিযান খুবই দরকার। এবং জনসাধারণের মধ্যে এই বোধটুকু গড়ে উঠলেই হয়ত পরিবেশ বা বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে উন্নতি সাধন করার কাজ খুব একটা অসুবিধা হবে না। তিনি এ সম্পর্কে প্রযুক্তি বিষয়ের গবেষণার ব্যাপারে বিভিন্ন সমাজ-কল্যাণ সংস্থাকে অনুরোধ জানান।

প্রফেসর ডঃ বি. ডি. নাগ চৌধুরী, প্রাক্তন উপাচার্য জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় আলোচনা সভার চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি তাঁর ভাষণে পরিবেশ ও সমাজের বাস্তবমুখী দিকগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমাদের পরিবেশে কতো জিনিস অবহেলিত হয়, নষ্ট হয় এবং ফেলে দিতে হয়। অথচ এগুলো যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকে। তিনি বলেন, জাপানে কোন কোন এলাকাতে মানুষ নিজেকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। সেখানে মানুষ কাঁচা মাছ খায়। 'সুশি' বলে। নিত্য অভ্যাসের ব্যাপার। মুক্ত বাতাস, পরিষ্কার জল এ সবই প্রাকৃতিক সৌন্দার্যবোধ এবং শিশুর অপরিহার্য উপাদান। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবেশের একটি সৌন্দর্য সুখ দিক গড়ে তোলা দরকার। মনোভাব বদলানো দরকার।

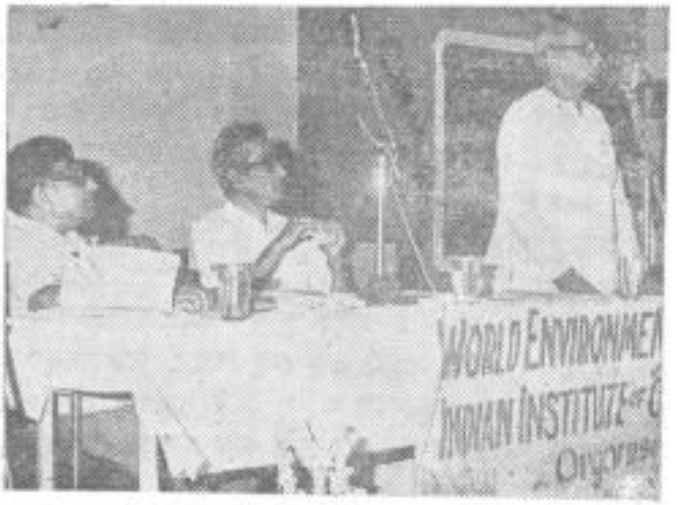

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন পরিবেশ মন্ত্রী ভবানী মুখার্জী।
পাশে বি. ডি. নাগ চৌধুরী ও আর. এন ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণ দেন ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌স্টিটিউট অফ্ কেমিক্যাল বায়োলজীর উপ-অধিকর্তা ডক্টর এস. সি. পাকড়াশী।

'পরিবেশ ও আমাদের সমাজ' এই প্রসঙ্গে একটি মনোরম সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারটিতে অংশ গ্রহণ করেন পরিবেশ বিজ্ঞানী শ্রীশংকর চক্রবর্তী, শ্রী শান্তিময় নিয়োগী, এবং শ্রীসুনীল ব্যানার্জী। এরা সকলেই পরিবেশের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নানাধরনের প্রশ্ন শ্রোতাদের মধ্যে থেকে আসে। প্রশ্নগুলো সবই পরিবেশকে কেন্দ্র করে এবং তাৎপর্যপূর্ণ। স্লাইডের মাধ্যমে শংকর চক্রবর্তী মহাশয়ের বক্তৃতা ছাত্র ও তরুণদের ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট করে।

অনুষ্ঠানে দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গলের সম্পাদক শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী পরিবেশের বর্তমানে নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তিনি এ ব্যাপারে প্রতিটি সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থাকে এগিয়ে এসে আগামী দিনে একটি নির্মল পরিবেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। —নিজস্ব সংবাদ দাতা

সুজলা সুফলা আমাদের পৃথিবী

বিমান বসু

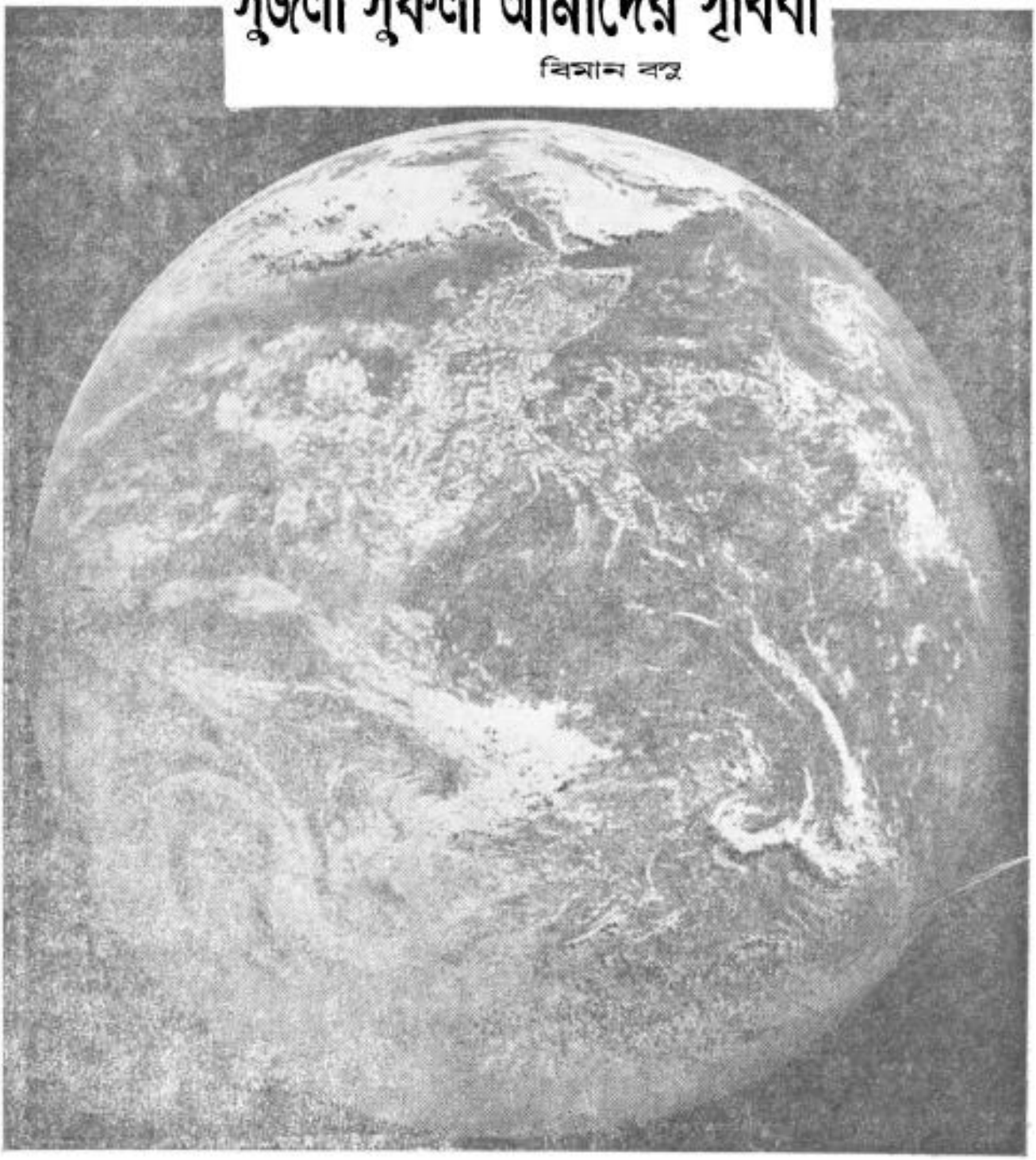

আপোলো-১৭ থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি

এ্যাপোলো চন্দ্রযান থেকে মহাশূন্যে ভাসমান পৃথিবীকে দেখে কোনও এক মহাকাশচারী মন্তব্য করেছিলেন যে, নীল-সমুদ্র এবং সাদা মেঘে ঢাকা পৃথিবীই হলো মহাকাশের সবচেয়ে আকর্ষনীয় বস্তু। এই মন্তব্য কতটা ঠিক তা

আমরা জানিনা। কিন্তু একটা কথা আমরা নিঃসংকোচে বলতে পারি। তা হলো, সৌরমণ্ডলের গ্রহদের মধ্যে আমাদের পৃথিবী অদ্বিতীয়। পৃথিবী ছাড়া আর কোনও গ্রহে জীবের আবির্ভাব হয়নি। বলা যেতে পারে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো তার বৈচিত্রপূর্ণ জীব ও উদ্ভিদ জগৎ।

এখন প্রশ্ন হলো, পৃথিবীর কি এমন গুণ আছে যার জন্য সে এই গৌরবের অধিকারী? একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে এর মূলে আছে পৃথিবীর পরিবেশ। যেমন ধরো বায়ুমণ্ডল। ঐ বায়ুমণ্ডলেই আছে জীব ও উদ্ভিদের জীবন ধারনের সমস্ত উপাদান। এছাড়া পৃথিবীর বুকে আছে অপর্য্যাপ্ত জল। পৃথিবীতে জীবনের মূল উৎস হলো ঐ জল আর বায়ুমণ্ডল। অবশ্য অতীতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আজকের মত ছিল না। সে সময় বায়ুমণ্ডলের উপাদান ছিল ভিন্ন কিছু তাতে জীবনের আবির্ভাবের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদান বিদ্যমান ছিল।

অনুকুল বায়ুমণ্ডল ছাড়াও, পৃথিবীর বুকে জীবের আবির্ভাবেরর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল সূর্য্যের তাপ ও আলো। সূর্য্য থেকে পৃথিবী এমনই একটা বিশেষ দূরত্বে আছে যে বুধ ও শুক্রের মত অত্যাধিক তাপে পৃথিবী ঝলসে যাচ্ছে না, আবার বাইরের গ্রহগুলির মত ঠাণ্ডায় জমেও যাচ্ছে না।

এক কথায় আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব এবং বিকাশের মূলে আছে পৃথিবীর জল ও মাটি এবং বায়ুমণ্ডল আর সূর্য্যের পরিমিত তাপ ও আলো। সব কিছুর সমষ্টিগত প্রভাবের ফলই হলো আজকের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পৃথিবী, যেখানে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের আবির্ভাব হয়েছে। এদের যে কোনও একটির যদি অভাব হতো তাহলে হয়ত পৃথিবীর বর্তমান রূপ অন্য রকম হত।

পৃথিবীর আকার কি তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। অন্য সব গ্রহের মত পৃথিবীও গোলাকার। নিখুঁতভাবে দেখতে গেলে অবশ্য এটি একটি পূর্ণ গোলক নয়, কারণ পৃথিবীর ধ্রুবীয় ব্যাস এবং নিরক্ষীয় ব্যাসের মধ্যে তফাৎ

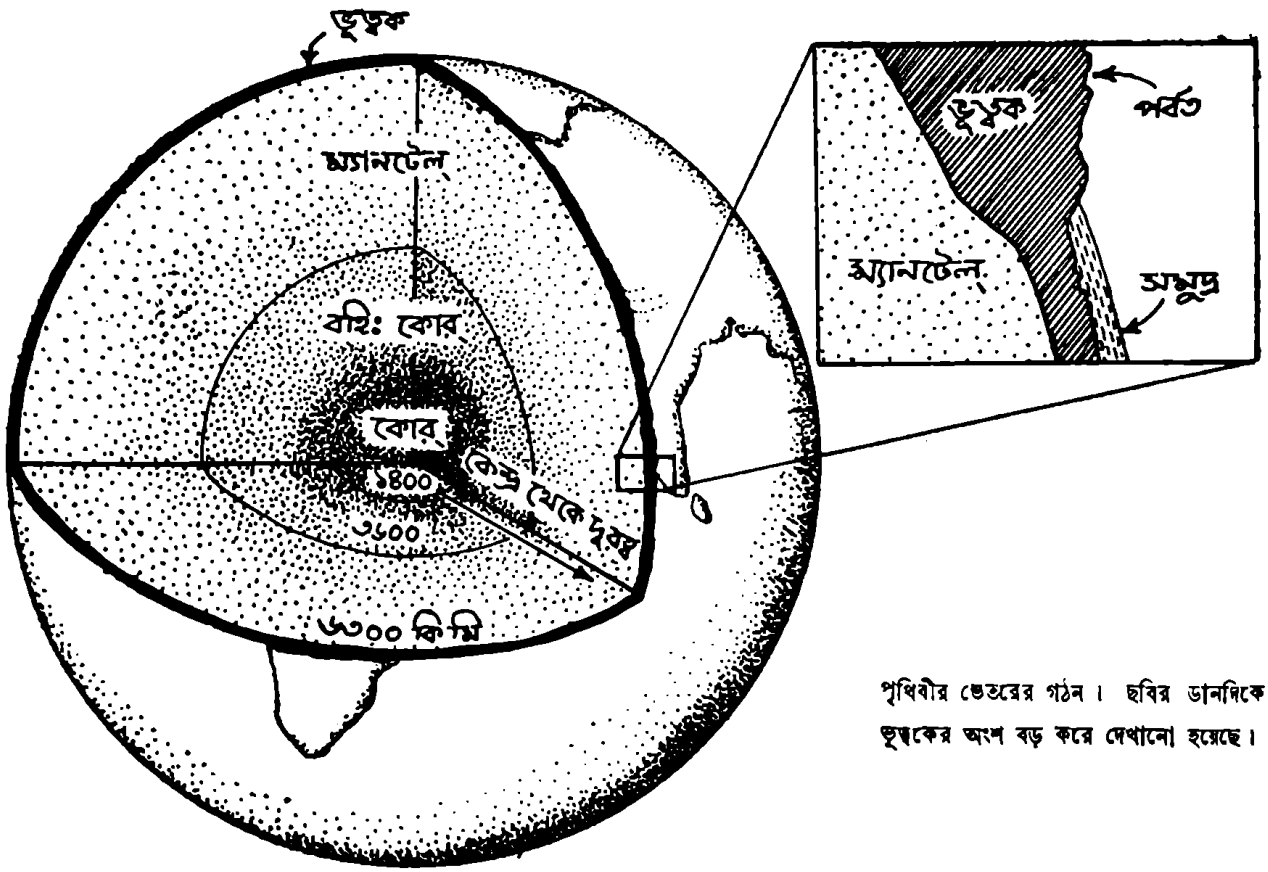

পৃথিবীর ভেতরের গঠন। ছবির ডানদিকে ভূত্বকের অংশ বড় করে দেখানো হয়েছে।

আছে। তবে এই তফাৎ খুবই সামান্য। সর্বাধুনিক মাপজোক থেকে জানা গেছে যে পৃথিবীর ধ্রুবীয় ব্যাস হলো ১২,৭১৪ কিলোমিটার, আর নিরক্ষীয় ব্যাস হলো ১২,৭৫৬ কিলোমিটার। মানে মোট তফাৎ মাত্র ৪২ কিলোমিটারের। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে আরও একটা কথা জানা গেছে। সেটা হলো এই যে, পৃথিবীর দুই মেরুদেশ সমান মাত্রায় চাপা নয়। উত্তর মেরুর দিকে কম চাপা, দক্ষিণ মেরুর দিকে বেশী চাপা। দেখা গেছে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উত্তর মেরুর দূরত্ব দক্ষিণ মেরুর দূরত্ব থেকে প্রায় ৪০ মিটার বেশী। অবশ্য এ তফাৎ অতি তুচ্ছ।

আয়তনে আমাদের পৃথিবীর স্থান হলো সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির মধ্যে ঠিক মাঝামাঝি। চারটি গ্রহ—বুধ, শুক্র, মঙ্গল এবং প্লুটো পৃথিবীর তুলনায় ছোট। অপরদিকে অন্য চারটি গ্রহ—বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, এবং নেপচুন হলো পৃথিবীর চেয়ে আয়তনে অনেক বড়।

আয়তনে মাঝামাঝি হলেও, সৌরমণ্ডলের গ্রহদের মধ্যে পৃথিবীর ঘনত্ব হলো সবচেয়ে বেশী, প্রায় ৫·৫। আর সেজন্য আয়তনের তুলনায় এর ওজন বা ভরও খুব বেশী। হিসেব করে দেখা গেছে যে পৃথিবীকে যদি কোনও অতিকায় দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা যায় তবে সে ওজন হবে প্রায় ছ'কোটি কোটি কোটি (মানে ৬-এর পরে ২১টা শূন্য) টন!

পৃথিবীর ঘনত্বের এক প্রধান কারণ হলো এর আভ্যন্তরীণ গঠন। আগেই বলেছি পৃথিবী হলো মাটি পাথরের তৈরী গ্রহ। এর প্রধান উপাদান হলো লোহা আর পাথর যা ভূপৃষ্ঠের নিচে বিভিন্ন অবস্থায় স্তরীভূত হয়ে আছে।

পৃথিবীর ভেতরের গঠনটা কেমন তা জানা গেছে প্রধানতঃ ভূকম্প তরঙ্গের গতির অধ্যয়ন করে। ভূ-পৃষ্ঠের নানা স্থানে সাইসমোগ্রাফ বা ভূ-কম্প লেখা যন্ত্র লাগিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের মধ্য দিয়ে ভূ-কম্প-তরঙ্গের গতির অধ্যয়ন করে জানতে পারা গেছে যে পৃথিবীর ভেতরের বেশীর ভাগটাই হলো তরল পদার্থের তৈরী।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে মাটি খুঁড়ে যত নিচে নামা যায় তাপমানও তত বাড়তে থাকে। দেখা গেছে ভূপৃষ্ঠের নিচে প্রতি ৫০ মিটারে তাপমানে প্রায় ১ডিগ্রী সেল্‌সিয়স্ বৃদ্ধি হয়। মাত্র ৩কিলো মিটারে নিচেকার তাপমাত্রা পাওয়া গেছে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়স্ অর্থাৎ জলের স্ফুটনাঙ্কের সমান। ভূপৃষ্ঠের ৫০কিলোমিটার নিচেকার তাপমান এত বেশী যে সেখানে পাথর গলে যায়।

পৃথিবীর অভ্যন্তরের এই তাপের প্রধান উৎস হলো মহাকর্ষ বল। উপরকার পদার্থের প্রচণ্ড চাপের ফলেই ঐ প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়। অবশ্য মহাকর্ষ বল ছাড়াও ঐ তাপের আর একটি উৎস আছে। সেটা হলো তেজস্ক্রীয় পদার্থের ক্ষয়। তোমরা জানো তেজস্ক্রীয় বা রেডিও ধর্মী পদার্থের ক্ষয়ের ফলে তাপের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরেও প্রচুর তেজস্ক্রীয় পদার্থ আছে যার ক্ষয়ের ফলে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়। ভূ-পৃষ্ঠের কয়েক'শ

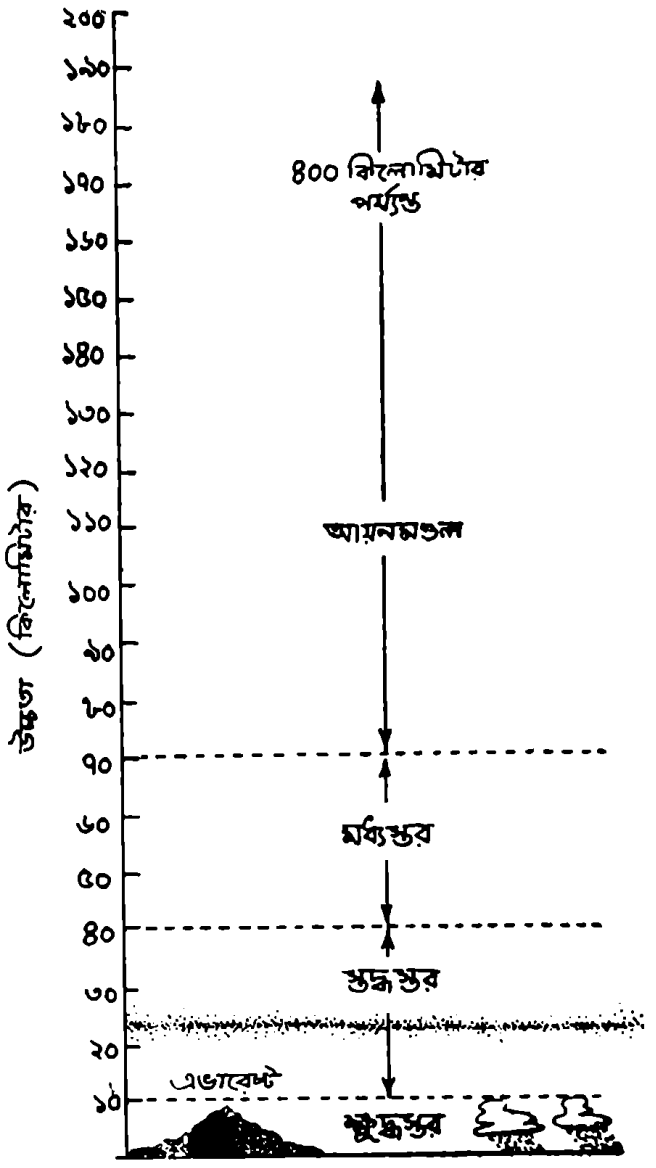

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

কিলোমিটার নীচে এই তাপ এত বেশী যে লোহা পাথর সবই গলিত তরল অবস্থায় সবসময় টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে।

তাপমান এবং ভৌত অবস্থার ভিত্তি ভূ-কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত এলাকাকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার নীচে পর্যন্ত কঠিন স্তরকে বলা হয় ভূত্বক। এই স্তরটির বেধ পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায় অতি তুচ্ছ। কিন্তু এর ওপরই নির্ভর করে আছে পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবন। কারণ পৃথিবীর মাটি, জল এবং যাবতীয় খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় কেবল মাত্র গ্র্যানাইট ও ব্যাসাল্ট জাতীয় পাথরের তৈরী এই পাতলা আবরণটির মধ্যে।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারের এক উল্লেখনীয় উপাদন হলো ওজোন গ্যাস। ওজোন গ্যাসের বিশেষত্ব হলো এই যে সূর্য থেকে যে অতিবেগুনী রশ্মি আসে তা এই ওজোনের স্তর ভেদ করে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে অতিবেগুনী রশ্মি হলো প্রাণী জীবনের পক্ষে মারাত্মক। সুতরাং বুঝতেই পারছো স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ওজোন পৃথিবীতে প্রাণিজীবনের পক্ষে কতটা লাভ-দায়ক।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ওপরের স্তরকে বলা হয় মধ্যস্তর বা মেসোস্ফিয়ার। তারপর ৭০ কিলোমিটার ওপর থেকে নিয়ে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আছে বায়ুমণ্ডলের সর্বশেষ স্তর আয়নমণ্ডল বা আয়নোস্ফিয়ার। নাম দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে এখানে আয়নিত অণুর প্রাচুর্য বেশী। সূর্যের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে এখানের বেশীর ভাগ বায়ু-কণাই সবসময় আয়নিত অবস্থায় আছে।

আয়নমণ্ডলের এক বিশেষ গুণ হলো এর বেতার তরঙ্গ প্রতিফলন ক্ষমতা, যার ফলে বেতার তরঙ্গ সহজেই বহু দূর পর্যন্ত পাঠানো যায়। বলতে পারি আয়নমণ্ডল না থাকলে হয়ত পৃথিবীতে বেতার তরঙ্গ মারফৎ দূর সঞ্চার আজকের মত সহজ হতো না।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে নদী, পাহাড়, সমুদ্র, বায়ু-মণ্ডল সমেত আমাদের পৃথিবী নিজের অক্ষে একবার পাক খায় ঠিক ২৪ ঘণ্টায়, যাকে আমরা বলি এক 'দিন'। পৃথিবী ঘোরে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে, তাই আমরা সূর্যকে পূর্ব দিকে উদয় হোতে এবং পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখি। নিজের অক্ষে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে এক-বার ঘুরে আসে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় যাকে আমরা বলি এক বছর। যেহেতু বছর আমরা ৩৬৫ দিনেই ধরি বাড়তি ৬ ঘণ্টার হিসেব প্রতি ৪ বছর অন্তর মিলিয়ে নেওয়া হয় ১ দিন যোগ করে। সেজন্যই প্রতি লীপ ইয়ারে ফেব্রুয়ারী মাসে ২৮ দিনের বদলে ২৯ দিন থাকে।

সূর্য থেকে দূরত্বে পৃথিবী হলো তৃতীয় গ্রহ। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব প্রায় ১৪ কোটি ৯৬ লক্ষ কিলো-মিটার। কিন্তু এই দূরত্ব সারা বছর সমান থাকে না। পৃথিবীর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হওয়ার দরুন—এই দূরত্বে বেশ কিছু কমবেশী হয়। যেমন ধরো প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে (উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল) পৃথিবী সূর্যের আরও ২৪ লক্ষ কিলোমিটার কাছে চলে আসে। মানে তখন তাদের মধ্যে দূরত্ব হয় ১৪ কোটি ৭২ লক্ষ কিলোমিটার। আবার জুলাই মাসের গোড়ার দিকে (মানে আমাদের গ্রীষ্মকালে) এই দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় ১৫ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার, মানে গড় দূরত্ব থেকে ২৪ লক্ষ কিলোমিটার বেশী।

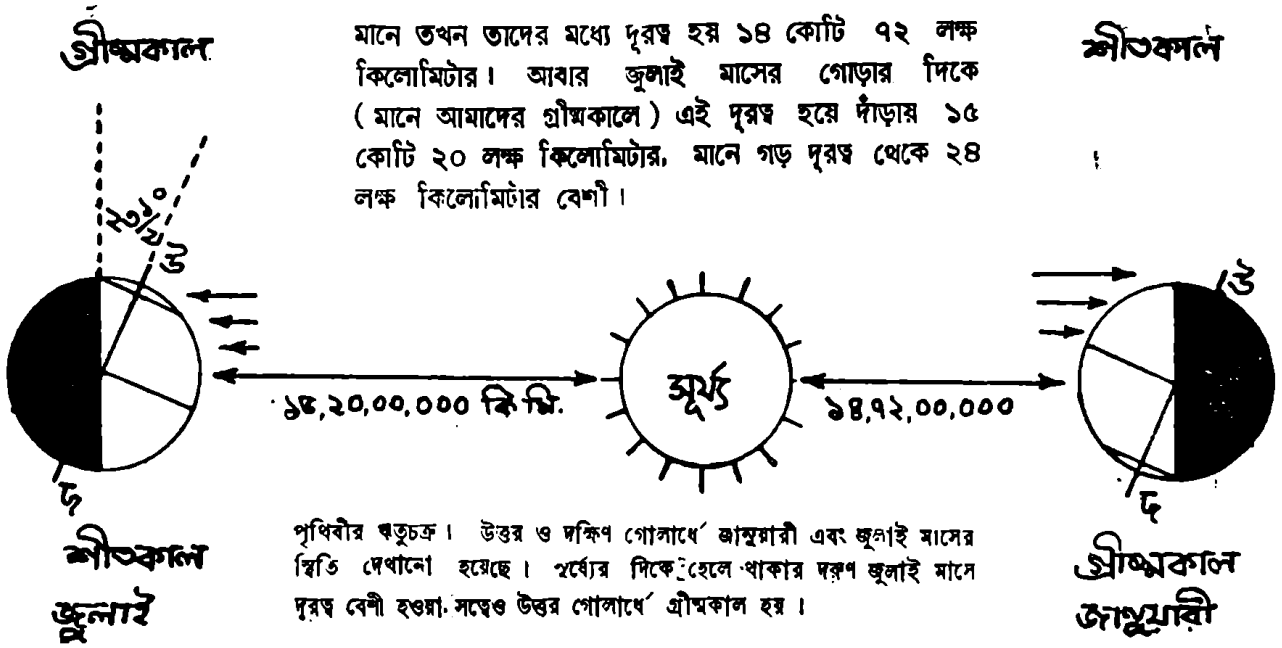

পৃথিবীর ঋতুচক্র। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে জানুয়ারী এবং জুলাই মাসের স্থিতি দেখানো হয়েছে। সূর্যের দিকে হেলে থাকার দরুণ জুলাই মাসে দূরত্ব বেশী হওয়া সত্ত্বেও উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল হয়।

ভূত্বকে কি কি আছে

অক্সিজেন	৪৬.৬ %
সিলিকন	২৭.৭২ %
এ্যালুমিনিয়াম	৮.১৩ %
লোহা	৫.০০ %
ম্যাগনেসিয়াম	২.০৯ %
ক্যালসিয়াম	৩.৬৩ %
সোডিয়াম	২.৮৩ %
পটাসিয়াম	২.৫৯ %
অন্যান্য	১.৪১ %

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গঠন

নাইট্রোজেন	৭৮.০৮ %
অক্সিজেন	২০.৯৪ %
আরগন	০.৯৩ %
কার্বন ডাই অক্সাইড	০.০৩ %
অন্যান্য	০.০২ %

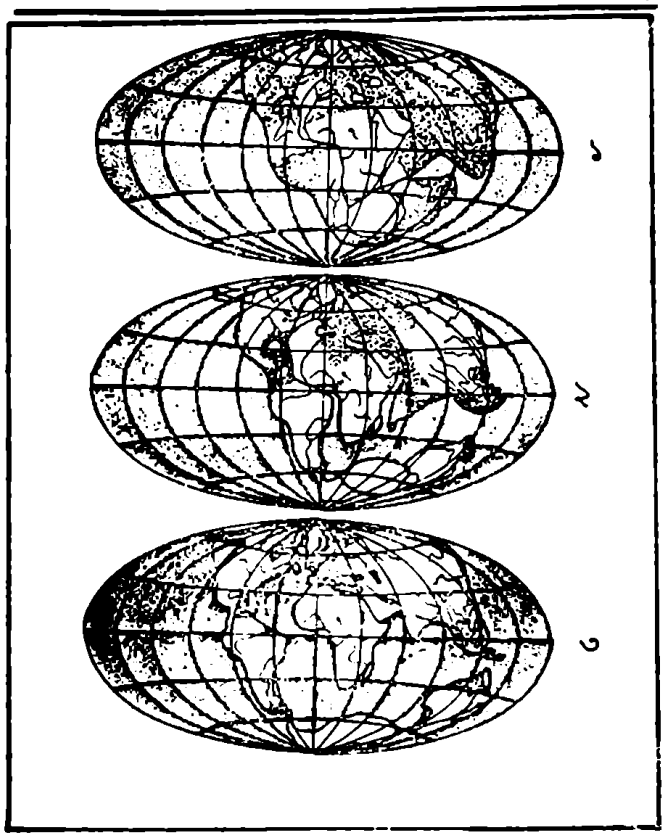

মহাদেশীয় চলন। ওপরের ছবিতে মহাদেশীয় ভূখণ্ডগুলি আজ থেকে সাড়ে সাত কোটি বছর আগে যেমন ছিল দেখানো হয়েছে। নীচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে বর্তমান স্থিতি।

তোমরা হয়ত ভাবছো ব্যাপারটা গোলমেলে। শীতকালের চেয়ে গরমকালে পৃথিবী সূর্য থেকে বেশী দূরে থাকে, তা কি করে হয়। আসলে কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পৃথিবীতে আমরা যে ঋতুচক্র দেখি তার প্রধান কারণ হলো, কক্ষতলে পৃথিবীর হেলে থাকা। পৃথিবী তার কক্ষতলে ২৩½ ডিগ্রী হেলে থাকার দরুন জুন-জুলাই মাসে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে এসময় সূর্য থেকে দূরত্ব বেশী হওয়া সত্ত্বেও উত্তর গোলার্ধে সূর্যের তাপ অনেক বেশী পড়ে, মানে সেখানে তখন গ্রীষ্মকাল হয়। পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের বেলায় অবশ্য ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। জুন-জুলাই মাসে সেখানে শীতকাল।

জানুয়ারী মাসে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ হেলে থাকে সূর্যের উল্টো দিকে। সেসময় দূরত্ব কম হলেও উত্তর গোলার্ধে সূর্য্যের তাপ পড়ে অনেক কম। সেজন্য হয় শীতকাল। দক্ষিণ গোলার্ধে সে সময় হয় গ্রীষ্মকাল।

প্রায় ৪৫০ কোটি বছরের পুরানো এই পৃথিবীতে প্রথম জীবকোষের আবির্ভাব হয়েছিল আনুমানিক ৩৫০ কোটি বছর আগে। মানুষ আসে তার অনেক, অনেক পরে। সর্বাধুনিক যে তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় পৃথিবীর বুকে প্রথম মানুষের আবির্ভাব ঘটে আজ থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ বছর আগে। তারপর সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর চেহারায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষও অনেক বদলে গেছে। মানুষ সভ্য হয়েছে। শহর, নগর গড়ে উঠেছে। কৃষি, কল-কারখানা মোটর, রেল, এরোপ্লেন এসেছে। এমনকি মানুষ চাঁদেও পৌঁছে গেছে।

কিন্তু এসবের সঙ্গে আরও একটা জিনিস এসেছে। পৃথিবীর যে পরিবেশ আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে সেই পরিবেশকেই মানুষ আজ ধ্বংস করে চলেছে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা এইভাবে যদি চলতে থাকে আমাদের পৃথিবী হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আর জীবন ধারণের উপযুক্ত থাকবে না। পৃথিবীকে এই পরিণতির হাত থেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হলো ব্যাপক হারে পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা। তা না হলে আমাদের এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা পৃথিবীও হয়ত একদিন 'সৌরমণ্ডলের অন্য সব গ্রহের মত মৃত গ্রহে পরিণত হবে।

৭ ইউ এফ্ কলেজ রোড, নিউ দিল্লী-১

প্রথম আলাপ

বিশাল মাপের আধুনিক টেবিল। বাহারী প্লাস্টিকে মোড়া মসৃণ শরীর নিওন লাইটের আলোয় ঝকঝক করছে। টেবিলে কয়েকটা ফাইলপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তারই একটার ওপরে অত্যন্ত নিরীহ ভঙ্গীতে সে বসে আছে। আর আমরা দশ-বারোজন বসে আছি মসৃণ টেবিলকে ঘিরে। নতুন এক তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারিগরী নিয়ে নিজেদের মধ্যে জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত।

আলোচনার ফুরসতেই তাকে আমি লক্ষ্য করেছি, এবং বোকার মতো ভেবেছি, ফাইলটাকে সুস্থিরভাবে চাপা দিয়ে রাখার জন্যেই তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে—অর্থাৎ, নিছক একটি ঘনাকার পেপার ওয়েট। তবে পেপার ওয়েট হলেও তার চেহারার বাহার সবাইকে ম্লান করে দেয়। ছ'-ছ'টা ঝকঝকে রঙের চৌকো চৌকো টুকরো জুড়ে কেউ যেন এক বিচিত্র দাবার ছক তৈরী করেছে। লাল, নীল, হলদে, সবুজ, কমলা ও সাদা। পেপার ওয়েট ও ফাইলের সামনেই চেয়ারে বসে আছেন অদ্ভুত 'পেপার ওয়েট'-এর মালিক। ডঃ উল্‌ফ্‌গ্যাং অপ্টেন্‌বার্গ। প্রাজ্‌মা ফিজিক্সে ডক্টরেট করেছেন। বর্তমানে যুক্ত রয়েছেন জার্মানীর বিখ্যাত টারবাইন-জেনারেটার তৈরির কোম্পানী ক্রাফ্‌ট্‌ওয়ার্ক ইউনিয়ন-এর ইলট্রুমেণ্টেশন ও কণ্ট্রোল বিভাগে। সুদূর জার্মানী ছেড়ে হাওয়া পথে এতো মাইল পাড়ি দিয়ে তিনি এসেছেন দিল্লীর এই বিশেষ মিটিং-এ হাজির থাকার জন্য।

সময়টা ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাস। দিল্লীর শীত বেশ দাপটের সঙ্গে তার রাজ্যশাসন করে চলেছে। এবং সেই শীতকে উপেক্ষা করেই আমরা মিলিত হয়েছি একটি অতিবিখ্যাত সরকারী সংস্থার অফিসে—এই জরুরী মিটিংয়ের জন্য। মিটিং চলার সময় বেশ কয়েকবার দেখলাম, ডঃ অপ্টেন্‌বার্গ তাঁর পেপার ওয়েটটিকে হাতে তুলে নিচ্ছেন; খুব সহজ ভঙ্গীতে নেহাৎই অন্যমনস্ক-ভাবে তাতে কয়েকটি মোচড় দিচ্ছেন; তারপর সেটাকে আবার নামিয়ে রাখছেন ফাইলের ওপর। আর প্রতিবারেই রঙীন ঘনকের ছ'টা পিঠে ফুটে উঠছে নতুন নতুন নকশা। ডঃ অপ্টেনবার্গ কিন্তু নির্বিকার। ঘন ঘন পাইপ টানছেন। মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন। আবার সেই বিচিত্র পেপারওয়েটের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন।

অপ্টেনবার্গের মুখের আদল অনেকটা শার্লক হোমসের মতো। তবে মাথার চুল সোনালী। চোখের তারা ঘন নীল। ঠোঁটের ওপরে পেল্লিল-গোঁফ। বিরাট স্বাস্থ্যের চেহারা। সর্বদা হাসিখুশি। আকাশ নীল রঙের একটা সিন্‌থিটিক গেঞ্জীতে দারুণ মানিয়েছে। সব মিলিয়ে তাঁকে বেশ আপন মনে হয়।

'পেপার ওয়েটের' কার্যকলাপ দেখে আমার কৌতূহল ক্রমেই বাড়ছিল। অবশেষে আর ধৈর্য ধরতে না পেরে জিনিসটা চেয়েই বসলাম অপ্টেনবার্গের কাছ থেকে। বললাম, 'ডক্টর, ওই মজার জিনিসটা একবার দেখতে পারি?'

পাইপে গভীর টান দিয়ে একটু হেসে বস্তুটা বাড়িয়ে দিলেন অপ্টেনবার্গ। তাঁর ওই সামান্য হাসির তাৎপর্য তখন বুঝিনি, পরে বুঝেছিলাম।

হাতে নিয়ে জিনিসটা ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখলাম। দৈর্ঘে প্রস্থে ও উচ্চতায় মোটামুটি তিন ইঞ্চি মাপের একটা কিউব, বা ঘনক। সেটার এক-একটা পিঠে ছোট ছোট ন'টা রঙীন কিউব, তিনটে থাকে সাজানো। যে কোন পিঠের যে কোন একটা থাক-কে খুব সহজে ঘোরানো যায়—ঘড়ির কাঁটার মতো, বা তার উল্টোদিকে। আর এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই তৈরি করতে হয় নানান নক্‌শা।

সুতরাং টেবিলের নিচে আড়াল করে শুরু হলো আমার প্রচেষ্টা। ডঃ অপ্টেনবার্গকে যেভাবে ঝটপট নকশা তৈরি করতে দেখেছি, তাতে আমারও সময় বেশি লাগার কথা নয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড! আমার হাতে কিউবটা ক্রমশঃ অবাধ্য হয়ে উঠতে লাগলো। ওটার অবাধ্যতা যতো বাড়তে লাগলো, আমার জেদও একই হারে চড়তে লাগলো। অবশেষে, প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় শুধুমাত্র একদিকের পিঠে সাদা রঙ ফিরিয়ে আনতে পারলাম। অর্থাৎ, সেই পিঠের

1 থেকে 9, সব কটা ক্ষুদে কিউবের (চিত্র-1) রঙই সাদা। কিন্তু অন্য পাঁচটা দিক বিচিত্র রঙে ছড়ানো ছেটানো হয়ে রইলো। শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে জিনিসটা ফিরিয়ে দিলাম অপ্টেনবার্গের হাতে। দেখে অতো সহজ মনে হয়েছিলো, কিন্তু সমাধান করতে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে গেলো কেন?

ঘটনা। সে সময়ে ভারতে রুবিক কিউব আসেনি, তার বিশ্বজয়ের কথাও কেউ জানে না। আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ এই কিউব চর্চা নিয়ে মত্ত।

প্রখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো ছবি আঁকার এক বিশেষ জ্যামিতিক রীতি, 'কিউবিজম্', নিয়ে একসময় পৃথিবী তোলপাড় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর 'কিউবিজম্' যে

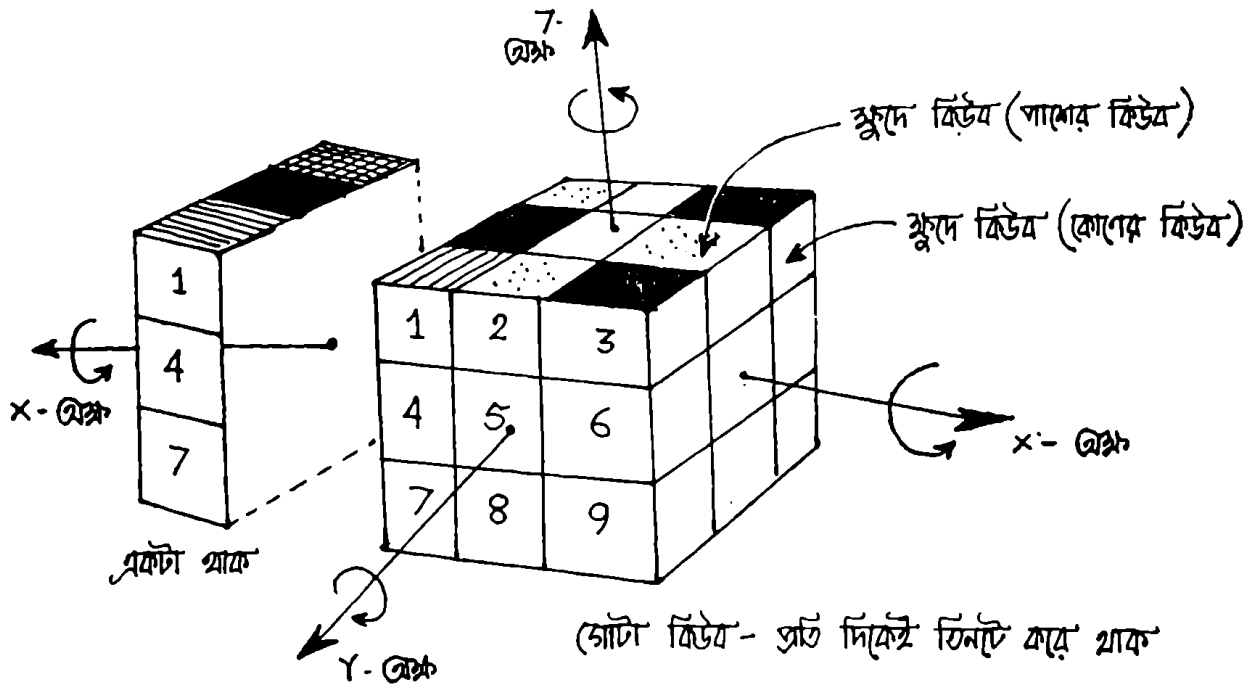

চিত্র -1

মজার কিউব ও তার একটা উল্লম্ব র‍্যাক-কে খুলে দেখানো হয়েছে। র‍্যাকগুলো X, Y, ও Z - অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরতে পারে।

অপ্টেনবার্গ কিউবটা হাতে পেয়েই চোখ কপালে তুলে কপট বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন। অর্থাৎ, কি ব্যাপার, পারলে না? যেন এই কথাটাই বলতে চাইলেন। তারপর পাইপে বার দুয়েক টান দিয়ে ঝটপট কিউবের র‍্যাকগুলোকে নানানভাবে মোচড় দিয়ে চললেন। একটু পরেই কিউবের ছ'টা পিঠে ছ'টা রঙ ফিরে এলো। তখন ডক্টর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখলে তো, কি সহজ?'

আমি কোনরকমে হেসে ওঁর কথায় সায় দিলাম।

এই হলো রুবিক কিউবের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপের

এতো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, একথা বোধহয় স্বয়ং পিকাসোও ভাবেন নি।

তারপর কাজের ফাঁকে ফাঁকে অপ্টেন্‌বার্গের সঙ্গে যখনই কথাবার্তা হয়েছে তখনই ঐ কিউব নিয়ে নানান প্রশ্ন করে তাঁকে আমি ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছি। তখন জেনেছি, জিনিসটা শুধুই একটা খেলনা বা ধাঁধা। আমি প্রথমে ওটাকে পেপার ওয়েট ভেবেছিলাম শুনে অপ্টেনবার্গ খুব হাসলেন। তারপর বললেন, 'এটা আমি বছর দুয়েক হলো কিনেছি। কি নাম তা জানি না। তবে তুমি এটাকে এক ধরনের ম্যাজিক কিউব বলতে পারো।'

'কত দাম?' জিজ্ঞেস করায় উত্তর পেলাম, 'আমি কিনেছিলাম সাত মার্ক দিয়ে। তবে সম্প্রতি দাম বেড়ে উনিশ মার্ক হয়েছে।' জার্মানীর এক মার্ক আমাদের দেশের চার টাকার কিছু বেশি। ভেবেছিলাম, ওঁকে

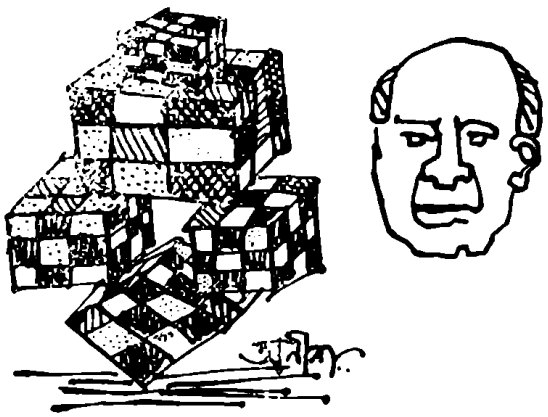

চিত্র—2 : পিকাসো এবং রুবিক কিউবিজম্

অনুরোধ করবো আমার জন্যে একটা কিউব পাঠিয়ে দিতে, কিন্তু বর্তমান দাম শুনে অনুরোধ করতে সংকোচবোধ করলাম। অথচ একটি নিজস্ব কিউব হাতে পাওয়ার জন্য মনটা ছটফট করছে।

কিউবের রঙের ধাঁধা মেলাতে পারিনি আমি। তার ওপর আর একটা ধাঁধা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেললো। ক্ষুদে কিউবগুলো কি এমন কায়দায় জোড়া আছে যে প্রত্যেকটা থাক খুব সহজে তিনটে বিভিন্ন দিকে (X, Y ও Z-অক্ষ) ঘুরতে পারে? বহু ভেবেও এর কোন উত্তর বের করতে পারলাম না।

বিপদটা আরও বেড়ে গেলো পরের দিন। অপ্টেনবার্গের কাছ থেকে কিউবটা নিয়ে বেশ তেড়েফুঁড়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি, আচমকা দুটো ক্ষুদে কিউব খুলে বেরিয়ে এলো হাতে। এই দুর্ঘটনায় ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেলাম। তখন 'বাহুবল'কে শ্রেষ্ঠ পথ মনে করে চেষ্টা করলাম ক্ষুদে কিউব দুটোকে কোনরকমে চেপে জোড়া লাগিয়ে দিতে। শুধু ভাবছি, অপ্টেনবার্গকে কি জবাব দেবো। এমন সময় ভাগ্যদেবী সদয় হলেন। কিউব দুটো অদ্ভুত ভাবে জোড়া লেগে গেলো। কয়েকটা থাক দু-তিনবার ঘুরিয়ে দেখি সবকিছু আবার আগের মতোই ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

এতে আমার স্বস্তি পাওয়ার কথা, কিন্তু উল্টে অস্বস্তি বেড়ে উঠলো। প্রথমতঃ ম্যাজিক কিউবের থাকগুলো এমনভাবে পরস্পরের গায়ে আটকানো যে ওগুলো তিনটে অক্ষকে (X, Y ও Z) কেন্দ্র করে স্বচ্ছন্দে (চিত্র-1) ঘুরতে পারে। তার ওপর ক্ষুদে কিউবগুলোকে খুলে আবার সামান্য চাপ দিয়েই জোড়া লাগানো যায়। এরকম কোন মেকানিক্যাল জয়েন্ট কি বাস্তবে তৈরী করা সম্ভব? সম্ভব তো নিশ্চয়ই, কারণ আমার হাতেই তো ধরা রয়েছে সেই অদ্ভুত কিউব। খুব ইচ্ছে করছিলো সব ক'টা ক্ষুদে কিউব খুলে দেখতে, কিন্তু তখন তো আমি নিশ্চিত নই যে খুলে ফেললেও জিনিসটাকে সহজেই আবার জুড়ে ফেলা যাবে! তার ওপর পরের জিনিস। সুতরাং কিউবটা মালিককে ধন্যবাদ সমেত ফেরৎ দিলাম। এবং সেইদিন সন্ধ্যেবেলাতেই দিল্লী শহরের কয়েক-শো দোকান চষে ফেললাম ঐ বস্তুটির সন্ধানে। হাত নেড়ে বর্ণনা দিয়ে দোকানদারদের বোঝাতে লাগলাম, ঠিক কোন্ জিনিসটা আমি খুঁজছি। কিন্তু সকলেই অবাক ও নির্লিপ্ত। না, ও জিনিসের নাম কেউ শোনেনি; কেউ ওটা চোখেও দেখেনি।

মনে সামান্য দুঃখ নিয়েই ফিরে এলাম কলকাতায়। জিনিসটা খুঁজতে গিয়ে এখানেও হতাশ হলাম। পরিচিত অনেককে বিচিত্র বস্তুটির কথা বললাম। তবে বিশেষ আগ্রহ কেউই দেখালো না। তখন বুঝিনি, পনেরো মাস পরে এই কিউবটা হাতে পাওয়ার জন্য সারা কলকাতার মানুষ আমারই মতো তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠবে। কারণ, ইদানীং কিউব-চর্চায় গোটা কলকাতা কিউব-গ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ছোট-বড় সকলের কাছেই একটা করে রুবিক কিউব খুঁজে পাওয়া গেলে আজ আর অবাক হওয়ার কিছু নেই।

রুবিক কিউব কেমন করে এলো

একটা ধাঁধা ছোটবেলায় আমরা অনেকেই দেখেছি, যাকে বলা যায় 'সংখ্যা সাজানোর খেলা'। প্লাস্টিকের একটা চৌকো বাক্স; তাতে প্লাস্টিকের ছোট ছোট চৌকো টুকরো বসানো থাকে—1 থেকে 15 পর্যন্ত নম্বর দেওয়া। এই পনেরোটা টুকরোকে বর্গাকারে বাক্সের মধ্যে রাখলে মাত্র একটা ছোট চৌকো খোপ খালি থাকে। এই ছোট্ট জায়গাটাকে চাকতি নাড়াচাড়ার ব্যাপারে ব্যবহার করে সংখ্যা লেখা চৌকো চাকতিগুলোকে পরপর সাজানোটাই হচ্ছে আসল ধাঁধা। কোন চাকতিকেই কিন্তু বাক্স থেকে তুলে অন্য জায়গায় বসানো চলবে না। যা নাড়াচাড়া করার তা বাক্সে রেখেই করতে হয়। এই ধাঁধাটি আবিষ্কার করে-ছিলেন স্যাম লয়েড।

পরে এই জনপ্রিয় ধাঁধার নানান রকমফের বাজারে চালু হয়। যেমন, 1 থেকে 15 সংখ্যার বদলে কোন ছবির টুকরো ব্যবহার করা। তাতে পনেরোটা চৌকো

চাকতি ঠিক মতো সাজাতে পারলেই ছবির টুকরোগুলো ঠিক ঠিক মতো জোড়া লেগে গোটা ছবিটা তৈরী করবে।

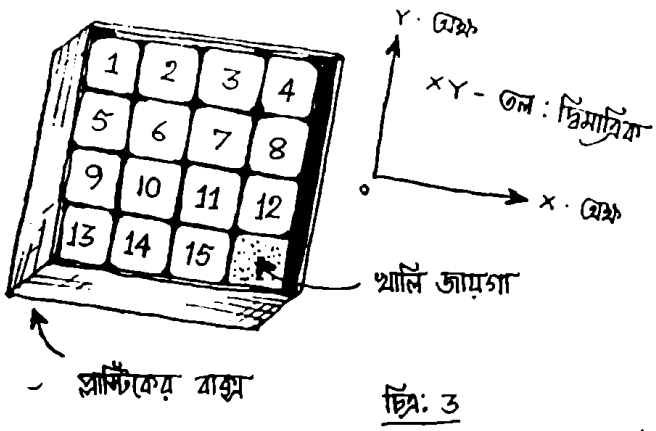

চিত্র: 3
সংখ্যা সাজানোর খেলা।

যে ধাঁধাটার কথা বললাম, সেটা দ্বিমাত্রিক। কারণ সবসময় একটা নির্দিষ্ট তলে (XY-তল) চাকতিগুলো নাড়াচাড়া করেই ধাঁধার সমাধান করতে হয় (চিত্র-3)। রুবিক কিউব যেন ঠিক এই ধাঁধারই ত্রিমাত্রিক রূপ। কারণ রুবিকের ধাঁধায় চৌকো চাকতির বদলে রয়েছে ক্ষুদে কিউব ; এবং সেগুলো X, Y ও Z, তিন দিকেই খুশী মতো ঘোরানো যায়।

কিউবের সূত্রপাত আজ থেকে আট বছর আগে। 1974 সালের গ্রীষ্মকালে জ্যামিতি-সংক্রান্ত নানান সমস্যা নিয়ে ভাবছিলেন আর্নো রুবিক। হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ট-এর 'স্কুল ফর কমার্শিয়াল আর্টিস্টস্'-এর অধ্যাপক

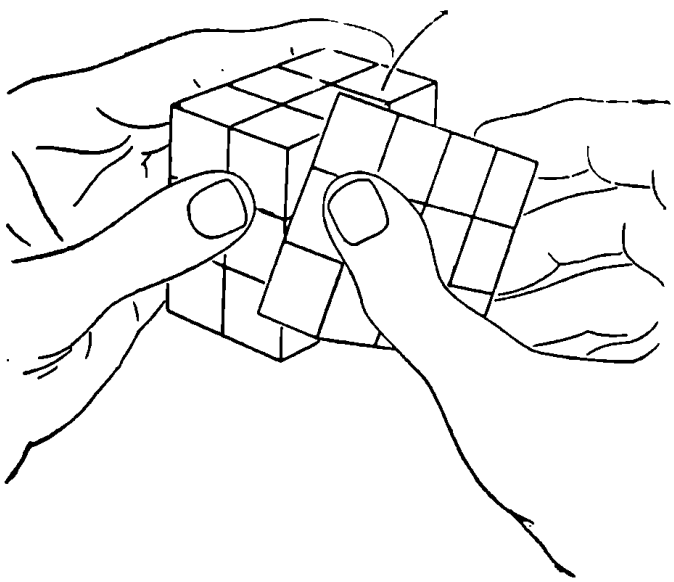

চিত্র—4 : কিউবের ডানদিকের থাক ঘোরানো হচ্ছে।

তিনি। ছাত্রদের সুবিধের কথা ভেবে ঘনবস্তুর বিভিন্ন ঘূর্ণন কিভাবে তাদের সহজে দেখানো ও বোঝানো যায়, সেই চিন্তায় ডুবে ছিলেন। হঠাৎই বুদ্ধিটা তাঁর মাথায় আসে। তিন থাকের এমন একটা $3 \times 3 \times 3$ কিউব, যার প্রত্যেকটা থাক ঘনকের কেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরতে পারবে (চিত্র-4)। তাহলেই পাওয়া যাবে মনের মতো জিনিস। তখন তিনি ভাবতে শুরু করলেন, ক্ষুদে কিউবগুলোকে কিভাবে পরস্পরের গায়ে এই রকম বিচিত্রভাবে জোড়া লাগানো যায়। সে এক বিরাট সমস্যা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারও সমাধান করলেন তিনি। তারপর একটা মডেল তৈরী করে ফেললেন। সেটা নিয়ে কয়েকটা থাক দু-চার পাক ঘোরানোর পর রুবিক পড়লেন তৃতীয় সমস্যায়। কিউবের প্রতি দিকের যে একটা সুষম রঙ ছিলো, থাক ঘুরিয়ে ক্ষুদে কিউবগুলো ওলটপালট হয়ে যাওয়ায়, রঙগুলো সব ওলটপালট 'ছত্রখান' হয়ে গেছে। সেই অবস্থা থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুরুর 'পরিপাটি' অবস্থায় —অর্থাৎ, ছ'টা দিকে ছ'রকম রঙ—তিনি আর নিয়ে আসতে পারছেন না। অবশেষে দু-সপ্তাহের চেষ্টায় বহু মাথা খাটিয়ে 'পরিপাটি' অবস্থায় ক্ষুদে কিউবগুলো নিয়ে এলেন রুবিক। (এটাই হচ্ছে রুবিক কিউবের ধাঁধা—রঙীন ক্ষুদে কিউবগুলোকে 'ছত্রখান' অবস্থা থেকে 'পরিপাটি' অবস্থায় নিয়ে আসা)। তারপর 1975 সালে তিনি এই বিচিত্র বস্তুটির পেটেন্ট নিলেন। এবং দুনিয়ার মানুষ মেতে উঠলো এই বিচিত্র আবিষ্কার নিয়ে।

রুবিক কিউবের বিক্রির খতিয়ান

১. হাঙ্গেরীর কোম্পানী 'পলিটেকনিকা' প্রথম 5000টি রুবিক কিউব তৈরী করে। মাত্র কয়েকদিনে সেগুলো বিক্রি হয়ে গেলে তারা আবার 7000 কিউব তৈরী করে। এখন চাহিদা মেটাতে 'পলিটেকনিকা'র 500 জন কর্মচারী দিনে চব্বিশ ঘণ্টা হিসেবে সপ্তাহে সাতদিন কাজ করেও হিমসিম খাচ্ছে।

২. আর একটি কোম্পানী, 'আইডিয়াল টয় কর্পোরেশন', প্রতি মাসে পনেরো লক্ষ কিউব বিক্রি করে আমেরিকা, হংকং ইত্যাদি জায়গায়।

৩. সারা পৃথিবীতে বিক্রি হয়েছে পাঁচ কোটিরও বেশী।

৪. ভারতের এক কিউব তৈরীর কোম্পানি হিসেব দিয়েছে, এবছরের প্রথম তিন মাসে ভারতের প্রায় এক লক্ষ লোক রুবিক কিউব কিনেছে।

৫. আর একটি ভারতীয় কোম্পানী, 'টয়টয়'. গত ছ'মাসে বিশ হাজার কিউব তৈরী করেছে। এই কোম্পানী দিনে 200 থেকে বর্তমানে 300 কিউব তৈরী করছে।

কিউব নিয়ে কিংবদন্তী

লণ্ডনের ওয়াটারলু রেল স্টেশন। একজন লোক বসেবসে একটা রঙীন প্লাস্টিকের কিউবে মোচড় দিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দর্শকের ভিড় জমে গেলো। একসময় ট্রেন এলো। কিউব হাতে লোকটি উঠে পড়লো ট্রেনে। দর্শকদের অর্ধেক যেন মায়ামুগ্ধ হয়ে তাকে অনুসরণ করলো। তারপর ট্রেন চলতে শুরু করতেই তারা সম্বিত ফিরে পেয়ে লাফিয়ে নেমে পড়লো ট্রেন থেকে—কারণ তারা ভুল ট্রেনে উঠে পড়েছিলো কিউবের বাহারী নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে।

এবারে দ্বিতীয় ঘটনা। নাইজিরিয়ার লাগোস-এ একটি চীনে রেস্তোরায় অল্পবয়েসী এক দম্পতি বসে রয়েছেন। হাতে নাড়াচাড়া করেছেন একটা রঙবেরঙের কিউব। এমন সময় হোটেলের মালিক এগিয়ে এলো। ব্যাপার স্যাপার দেখতে লাগলো। তারপর হঠাৎই বাজী ধরে বসলো : দম্পতির খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই সে রুবিকের ধাঁধার সমাধান করে দেবে। তা যদি না পারে, তাহলে সে তাদের খাবারের দাম নেবে না। পাকা তিনঘণ্টা ধস্তাধস্তি করার পর হোটেল-মালিককে হার স্বীকার করতে হয়েছিলো।

রুবিক কিউবের সমাধান করে যাঁরা ইতিমধ্যেই বেশ নাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রফেসর ডেভিড বি, সিঙমাস্টার অন্যতম। কিউবের সমাধান নিয়ে ষাট পৃষ্ঠার একটা ছোট বইও লিখেছেন তিনি। আমেরিকার একটি কম্পিউটার কোম্পানির একটি বিভাগে দেখা গেলো প্রায় সব কর্মিই রুবিক কিউব নিয়ে পাগল হয়ে মেতে উঠেছেন সমাধান করার চেষ্টায়। ফলে, বলা বাহুল্য, সমস্ত কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে। তখন কোম্পানীর মালিক নিরুপায় হয়ে বলেন, সবাইকে তিনি সিঙমাস্টারের সমাধানের বই কিনে দেবেন। তারা যেন দয়া করে অফিসে কিউবচর্চায় ক্ষান্ত হয়।

এই সব গল্প যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে মনে হয়, ফাঁসীর আসামী যদি জল্লাদের হাতে ফাঁসীর ঠিক পূর্বমুহূর্তে একটি রুবিক কিউব তুলে দেয়, তাহলে জল্লাদ বেচারা কিউবের নেশায় ডুবে গিয়ে হয়তো ফাঁসী দিতেই ভুলে যাবে!

কিউবের ভিতরের রহস্য :

ক্ষুদে ক্ষুদে ছাব্বিশটা কিউব কি করে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থেকে গোটা কিউবটা তৈরী করেছে, (চিত্র-1) এটা এক বিরাট প্রশ্ন। একটা ক্ষুদে কোণের কিউব তো ঘুরে-ফিরে রুবিক কিউবের যে আটটা কোণ রয়েছে তার যে কোন এক জায়গায় গিয়ে বসতে পারে। তাহলে সেটা অন্য ক্ষুদে কিউবের সঙ্গে লাগানো রয়েছে কিভাবে? কেউ কেউ বলেছেন, চুম্বকই এই রহস্যের উত্তর, কেউ বা বলেছেন রবারের সুতো, কেউ ভেবেছেন সবই কোন স্প্রীংয়ের কারসাজি। বলা বাহুল্য, আসল উত্তর কেউই অনুমান করতে পারেন নি। সুতরাং একটা রুবিক। কিউবের ভেতরের চেহারাটা খোলাখুলি ভাবে দেখে নেওয়া যাক।

রুবিক কিউবের আকর্ষণের কারণ

রুবিক কিউব দেখে, বুঝে, জেনে, তার অদম্য আকর্ষণের কয়েকটি কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি। এই আকর্ষণ এমনই যে প্রখ্যাত আপেক্ষিকতাবাদ-বিজ্ঞানী রজার পেনরোজ থেকে শুরু করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত সকলেই রুবিক কিউবের মায়ায় মুগ্ধ। ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানী, অঙ্কবিদ্, অফিসের সাধারণ কেরাণী, দোকানদার, কিশোর-কিশোরী, সকলেই এই একটি বিষয়ে বিনা দ্বিধায় একজোট হতে পেরেছেন। আকর্ষণের প্রধান কারণ হলো—

১. রুবিক কিউবের রঙচঙে বাহার।

২. কিউবের প্রতিটি থাকের অদ্ভুতভাবে চক্রবৎ ঘোরার ক্ষমতা।

৩. আপাতভাবে দেখে মনে হয়, কিউবের সমাধান খুবই সহজ। কিন্তু আসলে ঠিক তার উল্টো। রুবিক কিউবের বিজ্ঞাপনে বিদেশী কোম্পানীগুলো স্পষ্টই বলে দেয়, 'এই কিউব সমাধান করতে কোন অঙ্কবিদের যদি দু-সপ্তাহ লাগে, তাহলে তাঁর কপাল ভালো বলতে হবে।'

৪. ছোট ছোট 'ক্ষুদে কিউব' গুলো এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে থেকে ঘুরতে পারে যে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হয়।

(চিত্র—5) দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কিউবের ভেতরের গঠনটা এতো সহজ আর সরল যে ভেবে অবাক হতে হয়, এই সামান্য যান্ত্রিক জোড় কি করে এমন ভেল্কি দেখায়! তাছাড়া অল্প চাড় দিয়ে ক্ষুদে কিউবগুলোকে খুলেও ফেলা যায়।

রুবিক কিউবে মোট তিন রকমের ক্ষুদে কিউব আছে। প্রত্যেক পিঠের কেন্দ্রে অবস্থিত মোট ছ'টা ক্ষুদে কিউব (চিত্র-5ক), বারোটা পাশের ক্ষুদে কিউব (চিত্র-5খ) ও আটটা কোণের ক্ষুদে কিউব (চিত্র-5গ)। সুতরাং মোট ছাব্বিশটা ক্ষুদে কিউব দিয়ে তৈরী হয়েছে গোটা রুবিক কিউব। কেন্দ্রের ক্ষুদে কিউবগুলোর একটা দিকই

শুধু দেখা যায় ; পাশের ক্ষুদে কিউবের দু-পিঠ দেখা যায় ; এবং কোণের কিউবগুলোর তিনটে করে পিঠ দেখা যায়।

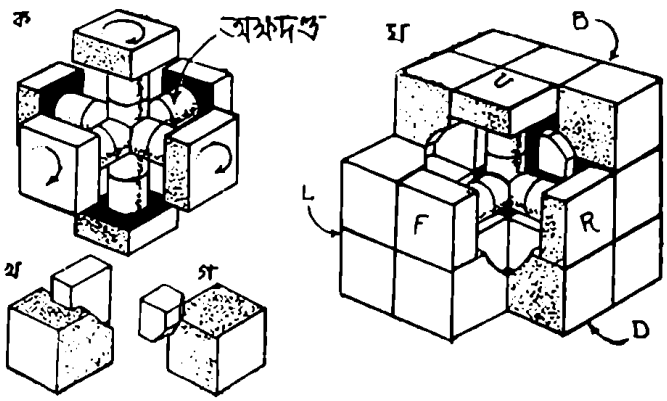

চিত্র—5 : (ক) কেন্দ্রের ছ'টি ক্ষুদে কিউব (খ) 'পাশের' ক্ষুদে কিউব (গ) 'কোণের' ক্ষুদে কিউব (ঘ) কিউবের কয়েকটি ক্ষুদে কিউব খুলে ফেলা হয়েছে।

কেন্দ্রের ক্ষুদে কিউবগুলো আসলে কিউব নয়, আয়ত ফলক। এর প্রত্যেকটা এক একটা অক্ষদণ্ডের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত যাতে সেগুলো অবাধে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরতে পারে। অক্ষদণ্ডগুলো আবার যুক্ত রয়েছে রুবিক কিউবের কেন্দ্রে অবস্থিত একটা ছ'মুখী দণ্ডসমষ্টির এক একটা দণ্ডের সঙ্গে।

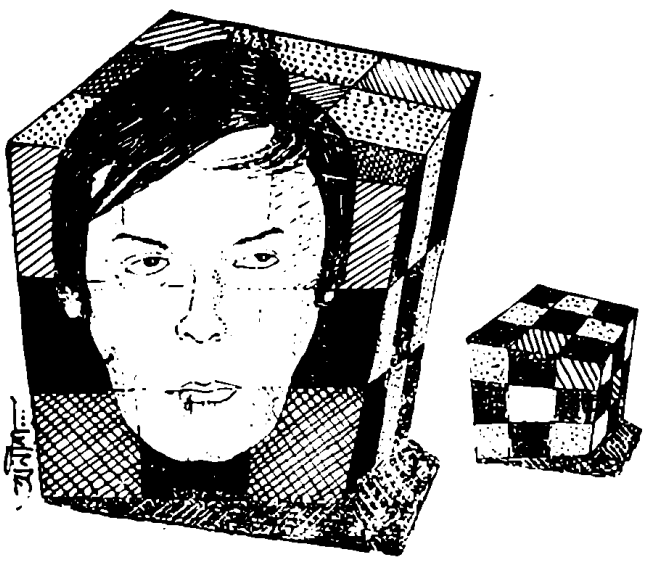

রুবিক মানেই কিউব !

কেন্দ্রের ক্ষুদে কিউবের কথা শেষ হলো। এবারে বাকি ক্ষুদে কিউবগুলোর কথা বলি। এগুলো (চিত্র-5খ ও গ) চেহারায় প্রায় গোটা কিউবের মতো, তবে প্রত্যেকটার ভেতর দিকের কোণা একটু করে ছেঁটে ফেলা হয়েছে, তারপর সেখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ছোট ছোট 'পা', যেগুলো রুবিক কিউবের ভেতরের দিকে ছ'মুখী দণ্ডসমষ্টির ঠিক খাঁজে খাঁজে চেপে বসে। ফলে ক্ষুদে কিউবগুলো এই বিচিত্র চেহারার 'পা'-য়ের সাহায্যে একে অপরকে ধরে রাখে অথচ এরা পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত নয়। কোণের ক্ষুদে কিউব ধরে রাখে পাশের ক্ষুদে কিউবের 'পা', এবং পাশের ক্ষুদে কিউব কোণের ক্ষুদে কিউবের 'পা' ধরে থাকে। ঠিক যেন পরস্পরের 'পায়ে ধরে সাধা'।

রুবিক কিউবের ওপরের থাকটা যখন ঘোরে (চিত্র-6), তখন মাঝখানের থাক ওপরের থাকের ক্ষুদে কিউবগুলোর 'পা' ধরে রাখে। কারণ, এই ধরে রাখার প্রয়োজনে এবং ঘোরার সুবিধের জন্য রুবিক কিউবে যে তিনটে 'মাঝের থাক' আছে, সেগুলোর মধ্যে একটা করে বৃত্তাকার খাঁজ রয়েছে। ফলে কিউবের যে কোন থাক নিজেকে কেন্দ্র করে অবাধে ঘুরতে পারে।

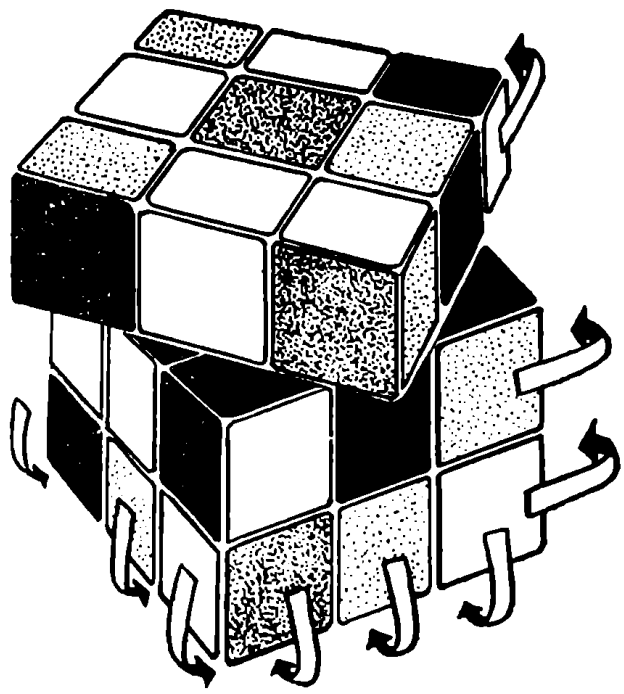

চিত্র—6: কিউবের ওপরের থাক ঘুরছে।

রুবিক কিউবের ভেতরের রহস্য আরও স্পষ্টভাবে জানা ও বোঝার একটা সহজ অথচ মোক্ষম উপায় আছে : তা হলো, একটি রুবিক কিউব কিনে তার ভেতরের রহস্য হাতে-নাতে ফাঁস করা। তাহলে জিনিসটার যান্ত্রিক কারিগরীকে আর অসম্ভব বা অবাস্তব বলে মনে হবে না।

আগামী সংখ্যায় থাকবে রুবিক কিউবের সমাধানের সূত্র ও কয়েকটি নতুন কিউবের বিচিত্র ডিজাইন।

রাতের অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান অনেকে দিনেই সেরে ফেলছেন

- এটা ভালোই। অনাবশ্যক আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? বিয়ে বাড়ীতে যেমন আলোকসজ্জা। যৌতুকের চাপে কনের বাপ-মা যখন অস্থির তখন আলোর মালাও বিছের কামড় হয়ে দাঁড়ায়।
- যৌতুক ও পণপ্রথা সামাজিক কলঙ্ক। তাই এর আদান-প্রদান চলে চোখের আড়ালে। এই কুপ্রথা আর আনুষঙ্গিক আড়ম্বর বন্ধ করা দরকার। দেহের জন্যে রক্ত যেমন অপরিহার্য, সামাজিক প্রগতির জন্য বিদ্যুৎও তেমনি। এই অত্যাবশ্যক বস্তুটির অপচয় করা অন্যায়।
- ১৯৮০-৮১তে আমরা ১১৮·৫ বিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছিলাম। ১৯৮১-৮২র উৎপাদন লক্ষ্য ১৩০ বিলিয়ন ইউনিট, এখনও অনায়ত্ত।

কুপ্রথাগুলিকে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং দেশের উন্নয়নে প্রয়াসী হওয়া সকলের কর্তব্য

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের কুপনটি ভরে পাঠিয়ে দিন।

ডেপুটী ডিরেকটর
মাস মেলিং ইউনিট
ডি. এ. ভি. পি.—বি. ব্লক
কস্তুরবা গান্ধী মার্গ
নিউ দিল্লী-১১০০০১

আমি নতুন বিশদফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে আগ্রহী। অনুগ্রহ করে এই সম্বন্ধে আমায় বাংলা/ইংরাজী পুস্তকাটি পাঠিয়ে দিন।

নাম _____

ঠিকানা _____ পিন _____

নতুন বিশদফা কর্মসূচী

davp 81/383/Bengali

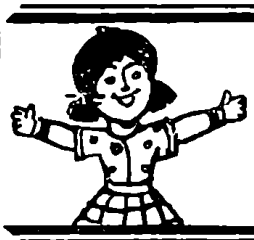

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা'র জুলাই '৮২ সংখ্যার দশ বা তার বেশী সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

কলকাতা : কাজরী মজুমদার, শবরী মজুমদার, বিপ্লব বিশ্বাস, সমীরণ, বিশ্বাস, স্মৃতি বিশ্বাস, রঞ্জনা দাস, ভাগীরথী মিত্র, অদ্রিজাকুমার দত্ত, শ্যামল বণিক, মিতালি মণ্ডল, রমা মণ্ডল, গৌতম মণ্ডল, অমিতাভ ব্যানার্জী, অরুণাভ ব্যানার্জী, অজয়েশ ঘোষাল, মলয় দাস, আশীষ কুমার বটব্যাল, প্রশান্ত কুমার দাস, কল্লোল দে, সেফ নাজরে হোসেন, তাপস চ্যাটার্জী, জয়দেব বসাক।

হাওড়া : সমীরণ কুমার বিশ্বাস, কমল মণ্ডল, শুভাশিস আতর্থী, বিমান পোদ্দার, অশোককুমার ডিংগাল, সুকান্ত ঘোষ, দেবাশিষ ভৌমিক, সুপ্রিয় পুরকারস্থ, সুগত দত্ত, মোহন চ্যাটার্জী, বিশ্বময় বল্লভ, বর্ণালী ভট্টাচার্য্য, মালবিকা চৌধুরী, বাণী বল্লভ, সীমা হালদার .

২৪-পরগণা : সোমা চ্যাটার্জী, প্রসূনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, চন্দন চ্যাটার্জী, স্বপনকুমার বেরা, রজনাথ মল্লিক, গৌতমকুমার পাণ্ডা, ইন্দ্রনীল ঘোষ, সুজয় সিনহা শ্যামসুন্দর মৈনান, কাঞ্চন কাঞ্জিলাল, তীর্থশংকর পাইন, অভিজিৎ সরকার, অভিজিৎ রায়, হৃষিকেশ রায়, অমিতাভ শীল, পূর্ণেন্দু খাঁ। লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, সুতপা ব্যানার্জী, জয়দেব দালাল।

হুগলী : মানিক সরকার, সঞ্জয় দাস, পরিচয়দাস, শিবনাথ খাঁ, নেপালচন্দ্র মাল, সুভাশীষ বল, শম্পা দাস, উৎপল ভড়, সন্দীপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, শুভ্রা চন্দ্র, কৃষ্ণাশিস বসু, আশীষ চ্যাটার্জী, সুজাতা ব্যানার্জী, মৌসুমী ঘোষ, অন্বয়জিৎ রায়, অভিজিৎ রায়।

বর্ধমান : রাজরনারায়ণ হাজরা, অরূপ দত্ত, সুমিতা দাশগুপ্ত, তপনদেব পাল, ইলা পাল, সঞ্চিতকুমার নিয়োগী, সব্যসাচী রায়, সোমেশ ব্যানার্জী, জ্যোতি প্রকাশ দাস, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, সমীরণ মহাপাত্র, দিব্যেন্দু সেন, তরুণকুমার সিংহ, অরুণকুমার সিংহ, বরুণকুমার সিংহ, নন্দিত সিংহ, গৌরীশঙ্কর চ্যাটার্জী, কাঞ্চনকুমার রায় ফাল্গুনী দাস, কৌস্তভলাল, পার্থপ্রতিম শীল, পুতুল সেন, কৃষ্ণগোপাল সেন, সোমা রায়, অনুভা হাজরা, গীতাঞ্জলী নন্দী, তপতী হাজরা, অলকা হাজরা।

মেদিনীপুর : দীপককুমার ষড়ঙ্গী, শমীকরঞ্জন সামন্ত, বিশ্বরঞ্জন বেরা, সোনালীরাণী বেরা, শুভাশীষ কাঞ্জিলাল, শ্যামলেন্দু ভৌমিক, অশিষকুমার ব্যানার্জী, তুষার দত্ত, অসীমকুমার দত্ত, প্রশান্ত ত্রিপাঠি, প্রবীরকুমার শাসমল, শিশিররঞ্জন পাল, তপনকুমার অধিকারী, পঞ্চানন সাহু, সুব্রতকুমার সাউ, সমাপ্ত সেন, অনিমারাণী সামন্ত, রঘুনাথ মণ্ডল, আশীষকুমার মাল।

নদীয়া : বিশ্বদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তপনকুমার চক্রবর্তী, মোহান্ত, মলয় মোহান্ত, সুভাষচন্দ্র আগরওয়ালা, নীলাদ্রি বিশ্বাস, শ্যামল বিশ্বাস, দেবীকা ব্যানার্জী, স্বপনকুমার পাল, প্রণবকুমার বিশ্বাস, দেবাশীষ কুণ্ডু, শ্যামল মণ্ডল, পল্লব।

বীরভূম : অনিমেষ চ্যাটার্জী, সুদীপ্ত পাল।

বাঁকুড়া : বিদ্যুৎকুমার মেদ্দা, মৌসুমী সেনগুপ্ত, পার্থ দত্ত।

মুর্শিদাবাদ : কবিরুল ইসলাম, মৌসুমী সাহা, বিবেকানন্দ সরকার, পলাশ মোহান্ত, বিকাশ মোহান্ত, দেবাশিষ বিশ্বাস।

পশ্চিম দিনাজপুর : সঞ্জয় সাহা।

জলপাইগুড়ি : চিন্ময় মজুমদার, অরুন্ধতী চক্রবর্তী।

মালদহ : প্রবাল মিত্র, চিন্ময় পাল, চিন্ময় দাস, মানিক পাল, দেবাশীষ শেঠ, কেয়া চৌধুরী, দেবাশিস শাসমল, মৃন্ময় পাল, স্বপন কর্মকার, কৌশিক চৌধুরী, তরুণকান্তি বিশ্বাস।

দার্জিলিঙ : জ্যোতিষ সরকার, অসিত দে সরকার।

আসাম : ডিব্রুগড় : রজত দাস।

বিহার : মুঙ্গের : সুজিত দাশ।

[ছোটদের দপ্তরে আরও অনেক বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার উত্তর দেরীতে এসে পৌঁছনোর জন্য তাঁদের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

প্রশ্নোত্তর

সেখ সাইফুর রহমান, কাটিয়াহাটা, ২৪ পরগণা।

প্রঃ সৌরমণ্ডলের দশম গ্রহটির নাম কি এবং কবে কোন বিজ্ঞানী এটি আবিষ্কার করেছেন?

উঃ ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন জ্যোতি-বিজ্ঞানী চার্লস্ কোআল সূর্য্যের কক্ষপথে একটি-গ্রহের মত বস্তুর সন্ধান পান যার নাম রাখা হয় 'চিরণ'। এটিকে প্রথমে সৌরমণ্ডলের দশম গ্রহ বলেই অভিহিত করা হয়। কিন্তু পরে জানতে পারা যায় যে এটি সম্ভবতঃ ধূমকেতু জাতীয় বস্তু। আনুমানিক ব্যাস কয়েক শ কিলোমিটার মাত্র। সূর্য থেকে চিরণের দূরত্ব পাওয়া গেছে ১২৭ কোটি কিলোমিটার থেকে নিয়ে ২৪০ কোটি কিলোমিটার পর্য্যন্ত।

অনুপম দাশ সিকদার, হাইলাশ্দি, কাছাড়, আসাম।

প্রঃ আগুন কি ধরনের পদার্থ? আগুনের কি ওজন আছে? সাধারণতঃ বাঁশ কাঠ প্রভৃতিতে আগুন জ্বলে কিন্তু পাথর, লোহা প্রভৃতিতে জ্বলে না, এর কারণ কি?

উঃ আগুন কোনও পদার্থ নয়, এটা কেবল শক্তির এক রূপ। যেহেতু আগুন পদার্থ নয়, এর কোনও ওজন নেই। পাথর লোহা প্রভৃতিতে আগুন জ্বলে না একথা ঠিক নয় কারণ অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে লোহাচূর ফেললে তা জ্বলে ওঠে। তবে এই জ্বলার ব্যাপারটা নির্ভর করে বস্তু বিশেষ এবং পরিবেশের ওপর। বাঁশ কাঠ প্রভৃতি সহজেই জ্বলে ওঠে কারণ এগুলি মূলতঃ সেল্যুলোজ জাতীয় কার্বনবহুল পদার্থের তৈরী।

কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য নূতনপাড়া, টালিগঞ্জ, কলকাতা

প্রঃ আগুনের রঙ হলদে, গ্যাসের এবং স্টোভের আগুন নীল হয় কেন?

উঃ কাঠের, তেলের বা মোমবাতির আগুনের যে হলদে রঙ দেখা যায় সেটা আসে আগুনের শিখার মধ্যে বিদ্যমান কার্বন কণা থেকে। বাসনে বা হ্যারিকেনের গায়ে যে ভুষো পড়ে সেটাও ঐ একই কারণে। শিখার মধ্যে ঐ কার্বন কণা উত্তপ্ত হয়ে হলদে আলো বিকীরণ করে। এটা হয় মূলতঃ দহনের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাস বা অক্সিজেন পর্যাপ্ত মাত্রায় না থাকলে। গ্যাসের ও স্টোভের আগুন নীল হয় কারণ তাতে পর্যাপ্ত মাত্রায় পৌঁছোবার ফলে কার্বন কণা থাকে না। তবে কোনও কারণে যদি ঐ বাতাসের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে গ্যাসের বা স্টোভের আগুনও হলদে হবে।

অরুণ আচার্য, পুরুলিয়া।

প্রঃ ধ্রুবতারা কি সৃষ্টির প্রথম থেকে অচল?

উঃ না। ধ্রুবতারাকে আকাশে অচল মনে হয় কারণ বর্তমানে পৃথিবীর অক্ষ ধ্রুবতারার দিকে মুখ করে আছে। এরকম কিন্তু চিরকাল ছিল না. থাকবেও না। কারণ পৃথিবীর অক্ষ স্থির নয়। এটি ধীরে ধীরে একটি বৃত্ত রচনা করছে এবং তার ফলে মহাশূন্যে এর লক্ষস্থলও একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে পৃথিবীর অক্ষ বর্তমান ধ্রুবতারার কাছা-কাছি হয়ত অন্য কোনও তারার দিকে মুখ করে ছিল, তখন সেটাই ছিল ধ্রুবতারা। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পরেও বর্তমান ধ্রুবতারা আর অচল থাকবে না, তার জায়গায় হয়ত অন্য কোনও নক্ষত্র তখন ধ্রুবতারা হবে। তবে আজ থেকে ২৬ হাজার বছর পরে আবার আজকের ধ্রুবতারা নিজের জায়গায় ফিরে আসবে।

নিয়মাবলী

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ডি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যা পিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকা ভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

অটোমেটিক কলিংবেল

নির্মলকান্তি ঘোষ

স্কুলের বিজ্ঞান মেলায় প্রতিযোগিতার জন্য অশোক ও সুব্রত দুজনেই তৈরী হচ্ছিল।

বিজ্ঞান মেলা শুরু হতে আর মাত্র তিন দিন বাকি। সুব্রত বেপাত্তা। অশোক বেশ ভালো করেই জানে, ওর গা ঢাকা দেবার আসল উদ্দেশ্য কি। সে ওর বাড়ি গেল, দেখা পেলো না। আবার গেল। এবার দেখা পেয়ে যায়। সে ছাদের সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে দেখতে পায়, ও ছাদে কি যেন করছে।

অশোক ওখান থেকে জিজ্ঞেস করে, সুব্রত, কি করছিস ?

—তেমন কিছু না, সুব্রত ঘাড় ফিরিয়ে অশোকের দিকে তাকায়।

—তবু শুনি ? অশোক সুব্রতর কাছে এসে দাঁড়ায়।

—একটা অটোমেটিক কলিং বেল তৈরি করলাম।

—এত জিনিস থাকতে হঠাৎ এটা তৈরি করতে গেলি ? সুব্রতর জিজ্ঞাস্য। আর এটা নিশ্চয়ই বিজ্ঞান মেলার জন্য।

—হ্যাঁ, এবং এটা বিশেষভাবে প্রয়োজন মার জন্য।

—মাসীমার জন্য ? কেন ?

—মার ইদানীং এলার্জি হয়েছে। মাকে রোজ এভিল খেতে হচ্ছে। ফলে মার দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে। আর এখন বর্ষাকাল। ছাদে এক গাদা কাপড় শুকোতে দেওয়া থাকে। মা প্রায়ই তুলতে পারে না। ঘুমে অচৈতন্য হয়ে থাকে। তাই সব দিক চিন্তা করে এটা তৈরি করেছি।

—তা নয় বুঝলাম। এবার পদ্ধতিটা একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলতো।

—তার আগে একটু কফি খাওয়া দরকার।

—তবে তো নিচে যেতে হবে।

—হ্যাঁ, আর কফি খেতে খেতেই বলবো। সেই দুপুর থেকে এক নাগারে কাজ করে চলেছি।

ওরা নিচে নেমে এলো।

বাড়ির ছাদে কাপড় শুকোতে দেবার একটা তোফা জায়গা। তাতে খেয়ো যাবার কোন ভয় থাকে না। কিন্তু হঠাৎ যদি বৃষ্টি নামে এবং তখন যদি বাড়ির লোক ঘুমিয়ে থাকেন তাহলে কাপড়-চোপড় ভিজে চুপ চুপে হয়ে যাবে। এ থেকে রেহাই পাবার জন্য একটা পদ্ধতির কথা বলা হলো। আর এর খরচ খুবই সামান্য।

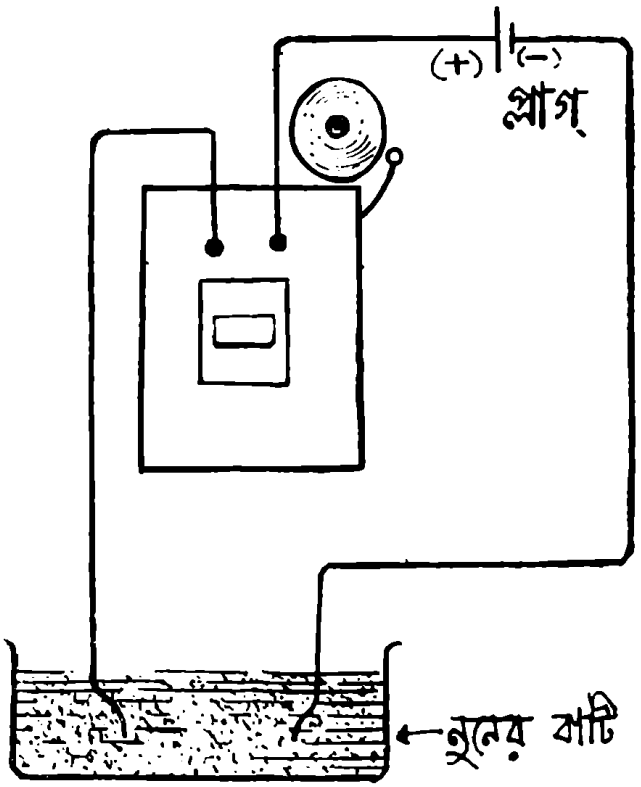

বাড়ির ছাদে একটা কাচের বা কাঠের বাটিতে নুন ভর্তি করে তাতে দুটো তার এমন ভাবে গুঁজতে হবে যাতে একটার সঙ্গে আর একটা না লেগে যায়। এবার একটা তার ঘরের মধ্যের Calling Bell-এ (+) লাগাতে হবে। তারপর আর একটা Calling Bell-এর (—) দিকে যুক্ত হবে। এরপর Negative-এর দিকে যে তারটা লাগানো হলো সেই তারটা অপর প্রান্তের plug-এ একটা point connection করতে হবে। আর নুন থেকে যে আর একটা তার বেরিয়ে আছে সেটা সোজা-সুজি plug-এ আর এক দিকে কানেকশন হবে। এরপর প্লাগটা প্লাগ পয়েন্ট-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সুইচটা অন করে রাখতে হবে। এখন ছাদে বৃষ্টি পড়লেই ঐ বাটিতেও বৃষ্টির জল পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেলটা বেজে উঠবে। কারণ সুইচ তো অন করাই আছে। যাতে কারেন্ট বেশী না খরচ হয় তার জন্য মেঘ দেখে সুইচ অন করে রাখা শ্রেয়। এতে ঘুমোলেও কোন ক্ষতি নেই। আরো বিশেষ করে বর্ষাকালে যাঁরা দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমোন, তাঁদের জন্য অটোমেটিক কলিং বেল একান্ত প্রয়োজন।

১২৮/২, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬।

ইউকোব্যাঙ্কে তার জমানো হাতখরচের টাকা থেকেই।

সত্যিই কি সুন্দর ট্রানজিস্টার কিনেছে আমার জন্য। ইউকোব্যাঙ্কে জমানো হাতখরচের টাকা থেকেই সে এটা কিনেছে।

এই ব্যাঙ্কে টাকা বেড়েই চলে। কারণ এই ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে ওঁরা তোমাকে আরো বেশি টাকা দেবেন। ওঁরা একে বলেন সুদ।

তোমার হাতখরচের টাকা বাড়িয়ে নেবার কি চমৎকার রাস্তা, তাই না?

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

[illegible]

এককোষী জীব ব্যাকটিরিয়া

সৌমিত্র মজুমদার

ব্যাকটিরিয়া ! নামটা শুনলেই কেমন যেন এক ঘৃণা জন্মে। তাই না? ঘৃণার কারণ এই এব কোষী জীব ব্যাকটিরিয়া কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, বিউ-বণিক প্লেগ, টিটেনাস, পশুর অ্যানথ্রাক্স ইত্যাদি অনেক রকম রোগ সৃষ্টি করে বহুপ্রকারে আমাদের ক্ষতি করে। কিন্তু এই ব্যাকটিরিয়াকে শুধু ঘৃণার চোখে দেখলেই চলবে না। তার কারণ, ব্যাকটিরিয়ারা আমাদের সভ্যতাকে কিছুটা এগিয়ে দিয়েছে। মানুষের অন্ত্রের মধ্যে এক ধরনের ব্যাকটিরিয়ার সহায়তায় ভিটামিন 'B_{12}' (যার অভাব ঘটলে 'রক্তাল্পতা' রোগ হয়) তৈরী হয়। এই ভিটামিনটি আবার রক্তের লোহিত কনিকা উৎপাদনে সাহায্য করে। মারাত্মক ধরনের রক্তাল্পতা রোগ ছাড়াও পার্নিশ্যাস্ অ্যানিমিয়া রোগ নিবারণে সাহায্য করে এই ভিটামিণ 'B_{12}'-ই। আবার, বিভিন্ন ভেষজ কল-কারখানাতে যে ভিটামিন 'B_{12}' তৈরী করা হয় তাও ঐ ব্যাকটিরিয়ারই সাহায্যে। দুধ থেকে দই, মাখন প্রভৃতি তৈরীতেও রয়েছে ব্যাকটিরিয়ারই (ল্যাক্টো-ব্যাসিলাস্-কেজি আই) অবদান। মাংস নরম করার জন্য আমরা যে ভিনিগার ব্যবহার করি, তাও 'মাইকো-ডারমাটা অ্যাসেটি' নামক ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে তৈরী করা হয়। আবার, 'অ্যাজোটোব্যাক্টর,' 'ক্লসট্রিডিয়ম,' নাইট্রোসোমোনাস 'নাইট্রোব্যাকটর,' 'রাইজোবিয়ম' প্রভৃতি কয়েক জাতের ব্যাকটিরিয়া নিরলসভাবে বাতাসের নাইট্রোজেনকে মাটিতে যোগ করে যায়। ফলে মাটিতে নাইট্রোজেন সারের অংশ বাড়ে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সরল ও ক্ষুদ্রতম জীবরূপে অভিহিত (ভাইরাসকে জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী বলে বাদ দিলে) এই ব্যাকটিরিয়া মানব সভ্যতাকে বহুভাবে প্রভাবিত করে। 'ব্যাকটিরিয়া' কথাটির সঙ্গে 'জীবাণু' শব্দটির যথেষ্ট সংযোগ রয়েছে। অর্থাৎ ব্যাকটিরিয়া সম্বন্ধে জানতে হলে প্রথমেই জানা প্রয়োজন জীবাণু সম্পর্কে সমস্ত কিছু।

আমাদের চারপাশের এই পরিবেশে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ অনেক রকমের জীব আছে। পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 'লিউয়েন হুক' এক সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তায় প্রত্যক্ষ করলেন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এক ধরণের জীব যাদের দেহ এত ক্ষুদ্র, যা খালি চোখে দেখা যায় না। এদের দেখতে হলে সাহায্য নিতে হয় অনুবীক্ষণ (Microscope) যন্ত্রের। তাই জীবাণুর অপর নাম—'আণুবীক্ষনিক জীব'। বর্তমানে বহু বিজ্ঞানীর অক্লান্ত সাধনায় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, বহু গবেষণার পর জানা গেছে যে, জীবাণু প্রকৃত পক্ষে দুই প্রকার কোষীয় সংগঠন যুক্ত হয়ে থাকে। যথা :—(i) প্রো-ক্যারিওটিক্ টাইপ এবং
(ii) ইও-ক্যারিওটিক্ টাইপ

ব্যাকটিরিয়া হল ঐ 'প্রো-ক্যারিওটিক্' টাইপের অন্তর্ভুক্ত এককোষী জীব।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, ব্যাকটিরিয়ার অবস্থান সর্বত্রই। অর্থাৎ, জল, স্থল, অন্তরীক্ষে মৃত ও জীবিত প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে, অতি নিম্ন তাপমাত্রায়—বরফে (—190°C), অতি উচ্চ-তাপমাত্রায়-উষ্ণ প্রস্রবনে (78°C)-সর্বত্রই ব্যাকটিরিয়ার অবাধ বিচরণ ও অবস্থান। এরা প্রোক্যারিওটিক্ জীবাণুর অন্তর্ভুক্ত একপ্রকার এক-কোষী জীব। এদের দেহগঠন অত্যন্ত সরল। এদের কোষে দানাযুক্ত সাইটোপ্লাজম ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। এদের কোষে কোন নির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস নেই। তবে D. N. A. (ডি-অক্সি রাই বো নিউক্লিক অ্যাসিড) কোষের মধ্যে ঘনীভূত অবস্থায় থাকে, যা ব্যাকটিরিয়ার বংশগতির নিয়ন্ত্রক। বহু বৈজ্ঞানিক বর্তমানে ব্যাকটিরিয়াকে 'উদ্ভিদ' অ্যাখ্যা দিয়েছেন।

ব্যাকটিরিয়ার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি এর উদ্ভিদ চরিত্র প্রকাশ করে থাকে :

(i) কোন-কোন ব্যাকটিরিয়া সবুজ উদ্ভিদের ন্যায় নিজেরাই নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে।

(ii) নমাংগদেহী উদ্ভিদের গঠন ও জননের সঙ্গে ব্যাকটিরিয়ার গঠন ও জননের মিল রয়েছে।

(iii) উদ্ভিদ কোষের ন্যায় ব্যাকটিরিয়ার কোষের চারপাশে 'সেলুলোজ' দ্বারা গঠিত কোষপ্রাচীর থাকে।

ব্যাকটিরিয়ার বংশবৃদ্ধিও আমাদের কাছে এক অতি বড় বিস্ময়। কয়েক হাজার ব্যাকটিরিয়া প্রতি কুড়ি মিনিট অন্তর নিজেদের বিভাজিত করে থাকে।

ব্যাকটিরিয়ার সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষণা আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ ব্যাকটিরিয়া সম্বন্ধে এই বিভিন্ন গবেষণার ফলে ব্যাকটিরিয়ার ধ্বংসাত্মক রূপের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে বিভিন্ন ক্ষতি থেকে আমরা যেমন মুক্তিলাভ করতে পারি, ঠিক তেমনি এর উপকারী রূপের সদ্ ব্যবহার করে মানব জীবনকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে দিতে পারি।

৭৩নং-পূর্বাচল পল্লী, পোঃ-রহড়া, খড়দহ, ২৪-পরগনা।

আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

গৌতম গলুই

গ্রাহামবেল, টেলিফোন।
বেয়ার্ড করলেন টেলিভিশন॥
লিপার্সি দিলেন দূরবীন।
গার্ডেন দিলেন ন্যাপথলিন॥
বাইসাইকেল, ম্যাকমিলান।
গেটলিং দিলেন মেসিনগান॥
হেনরি বিসেমার, ইস্পাত।
স্টিম ইঞ্জিন, জেমস্ ওয়াট॥
লং আনলেন ইথার, আর লাইনোটাইপ, মার্গেন্থেলার॥
এক্সরে দিলেন রঞ্জেন।
জোসেপ প্রিস্টলি, অক্সিজেন॥
লিউবেন হোক, মাইক্রোস্কোপ।
রেণী লেনেক স্টেথিস্কোপ॥
বালিনার-এর মাইক্রোফোন।
বাল্ব করলেন এডিসন॥
ডি. ডি টি দিলেন পালমূলার।
কোল্ট আনলেন রিভলবার॥

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

অমর নাথ রায়

১। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তের রঙ লাল হয় কিসের জন্যে?
২। মানুষের মুখে দুই পাটিতে মোট কয়টি দাঁত থাকে?
৩। স্নেহ দ্রবণীয় ভিটামিন কোন্‌গুলি?
৪। কোন্ মৌলের পরমাণুতে নিউট্রন একেবারেই নেই?
৫। কোন্ কোন্ সব্জীতে আয়োডিন থাকে?
৬। ক্যাথোড রশ্মির প্রকৃতি নির্ধারণ করেন কে?
৭। 'সিনাবার' কি জিনিস?
৮। প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় কতো ওজনের হাইড্রোজেন 22·4 লিটার আয়তন অধিকার করে?
৯। প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় 32 গ্রাম অক্সিজেনে কতো সংখ্যক অণু থাকে?
১০। কোনও সার্কিটে কারেণ্ট মাপবার জন্যে কোন্ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়?
১১। কাপড় কাচার সোডার সংকেত কি?
১২। বেঞ্জিনকে কোন্ যৌগ থেকে সংশ্লেষণ করা যায়?
১৩। 'ইউক্লিড' কে ছিলেন?
১৪। ডিমের সাদা অংশে কোন্ শ্রেণীর প্রোটিন থাকে?
১৫। লুই পাস্তুর কোন্ দেশের বৈজ্ঞানিক?
১৬। ভাইরাস ঘটিত রোগ কোন্‌গুলি?

(উত্তর পরবর্তী সংখ্যায় থাকবে)

(গত সংখ্যার বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার সমাধান)

১। এক বালতি ফুটন্ত জল! ২। রাইজোম বা গ্রন্থিকাণ্ড। ৩। মিশ্রণের উষ্ণতা হ্রাস পায়। ৪। 100 গ্রাম-সেণ্টিমিটার/সেকেণ্ড। ৫। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি। ৬। কার্বন-ডাই-অক্সাইড। ৭। ক্যালসিয়াম কার্বনেটের। ৮। হাইড্রোজেন জারিত হয়। ৯। গ্রীষ্মকালে। ১০। এক্সরশ্মির। ১১। HNO_3 ১২। হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস। ১৩। মাইক্রোবস্ বা জীবাণু বলে। ১৪। জলাতঙ্ক রোগ হয়। ১৫। হাঁ, পারে।

ভেবে ভেবে বল

শুভব্রত রায়চৌধুরী

(১) কয়লা নানা রকমের হয়, এক ধরনের কয়লা পাওয়া যায় যেগুলো খুব শক্ত। এদের নাম বলো।

(২) রাস্তা ঘাটে রঙিন বৈদ্যুতিক আলো আমরা ব্যবহার হতে দেখি। এদের মধ্যে নিয়ন গ্যাস থেকে একটি বিশেষ রংঙের আলো তৈরী হয়। এই রংটি কি বলতো?

(৩) সাধারণতঃ গরুর দুধে কত পরিমান জল থাকে।

(৪) কৃত্রিম উপায়ে মানুষকে হাসান সম্ভব। এর জন্য বৈজ্ঞানিকেরা একটি গ্যাস আবিষ্কার করেন। নীচের গ্যাসগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক ভেবে বলো (ক) হাইড্রোজেন অক্সাইড (খ) নাইট্রাস অক্সাইড (ঙ) কোনটাই নয়।

(৫) শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

$\frac{6729}{13458} = \frac{1}{\square}$, $\frac{5832}{17496} = \frac{1}{\square}$

$\frac{\times\times\times\times\times}{\times\times\times\times\times} = \frac{1}{4}$, $\frac{2943}{17658} = \frac{1}{\square}$

(৬) নীচের ছবিতে কয়েকটি জীবাণু আঁকা হয়েছে। এদের নাম বলো :—

(ক) (খ) 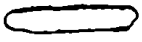 (গ)

(৭) পাশের ছবিটি কিসের?

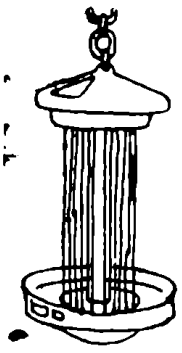

(৮) নুন উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতবর্ষের স্থান কতো?

(৯) এপ্রিল মাসে কলকাতার গড় তাপমাত্রা কতো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড?

ভেবে বলো'র উত্তর :—

(১) 'অ্যানথ্রাসাইড' (২) নিয়ন (৩) 87% (৪) N_2O [নাইট্রাস অক্সাইড] (৫) $\frac{4392}{17568}$

(৬) (ক) ককাস (Coccus) (খ) ব্যাসিলাস (Bacillas) (গ) ভিব্রিও (Vibrio) (৭) আলট্রাভাওলেট আলোর সাহায্যে • কীটপতঙ্গ • মারবার • যন্ত্র। (৮) পঞ্চম (৯) 30·7°C

শব্দকূট

নাজমুর নাহার (পলি)

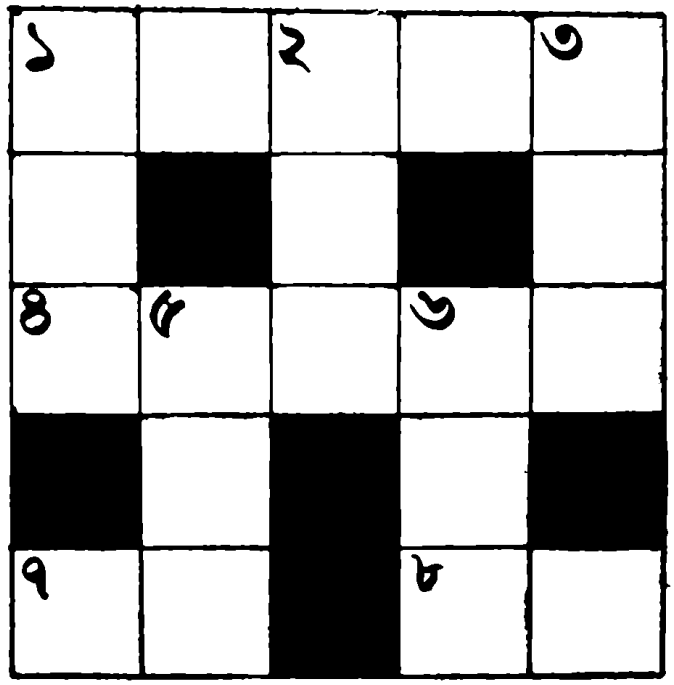

পাশাপাশি :

১ প্রোটোপ্লাজম থেকে নিসৃত তরল দ্রবণীয় জৈব প্রভাবক।

৪ কাঁচা তামার তার দিয়ে তৈরী, পদার্থ বিজ্ঞানে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রয়োজন।

৭ জলে দ্রাব্য কিছু ধাতব হাইড্রাক্সাইডের বাংলা নাম।

৮ ব্রায়োফাইটা জাতের উদ্ভিদ।

উপর-নীচ :

১ ডেঙ্গু জ্বরের রোগ বহনকারী মশা।

২ যৌগ থেকে হাইড্রোজেনের অপসারণ।

৩ শক্তিচালিত দ্বি-চক্রযান।

৫ তরল পরিমাপের মেট্রিক একক।

৬ পরমানুর ইংরাজী প্রতিশব্দ।

জুলাই সংখ্যার সংখ্যাকুটের সমাধান

a 1	b 9	c 1	d 1
e 9		f 9	1
g 1	h 9	0	2
i 8	0	0	0

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

ধীরেন বল

॥ পুজো সংখ্যায় 'হাবুল'এর দীর্ঘ রঙীন চিত্র কাহিনী থাকবে ॥

জুলে ভার্নে-র টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী : লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

R/ No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 2nd year • August 1982 Regd No WBCC/50

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

শারদীয় ১৩৮৯

৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭৩

রূপকথা নয়
ভূতের গল্প নয়
গোয়েন্দা কাহিনীও নয়
অথচ
যে বই নিয়ে
কাড়াকাড়ি
পড়বেই

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রচ্ছদমুদ্রন : রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২